প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৬ ◆ ২১ - ২৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহীর নবাই বটতলায় মা মারীয়ার সহায়তা

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শতবর্ষী উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইল্লা খ্রিস্টান জনপদ

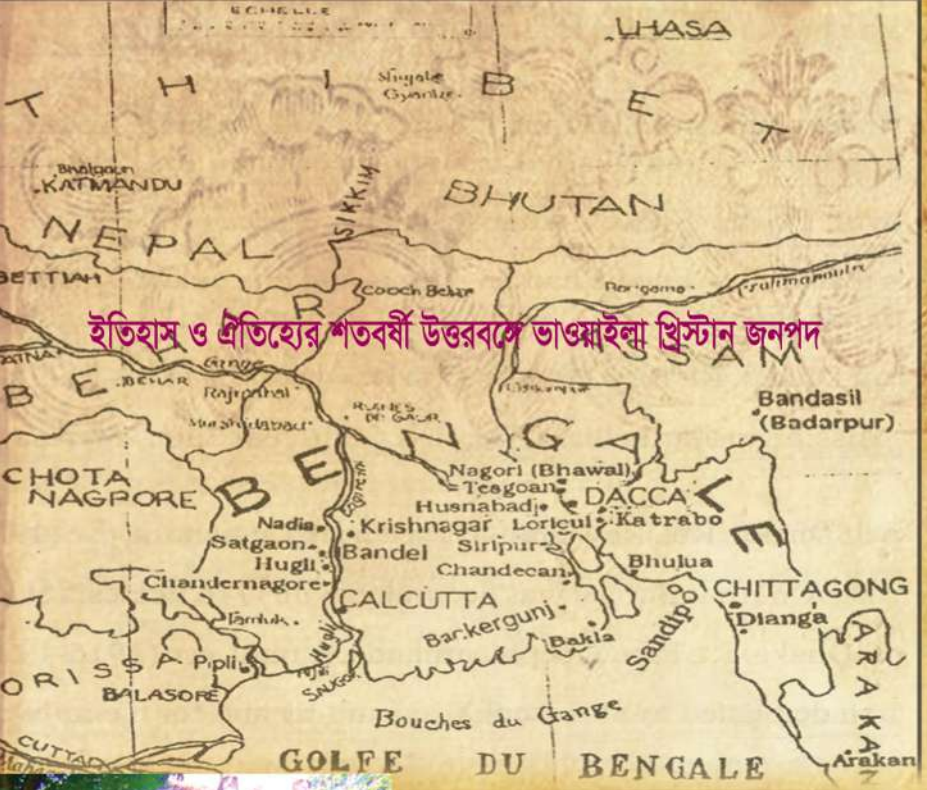

হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয়ান জনপদ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

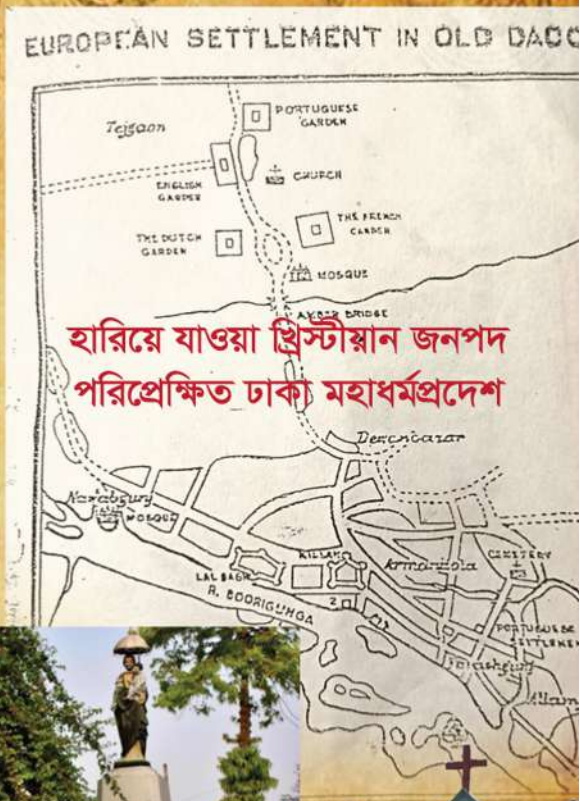

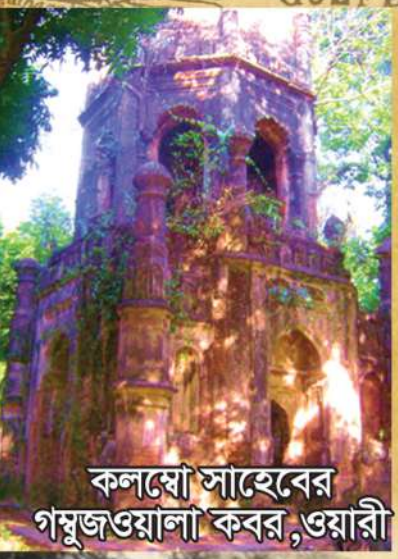

কলম্বো সাহেবের গম্বুজওয়ালা কবর, ওয়ারী

শতবর্ষী আর্চবিশপ ভবন, ঢাকা

পাথরঘাটা, চট্টগ্রামে পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ

ইতিহাসের সাক্ষী
হলিক্রশ চার্চ, লক্ষ্মীবাজার

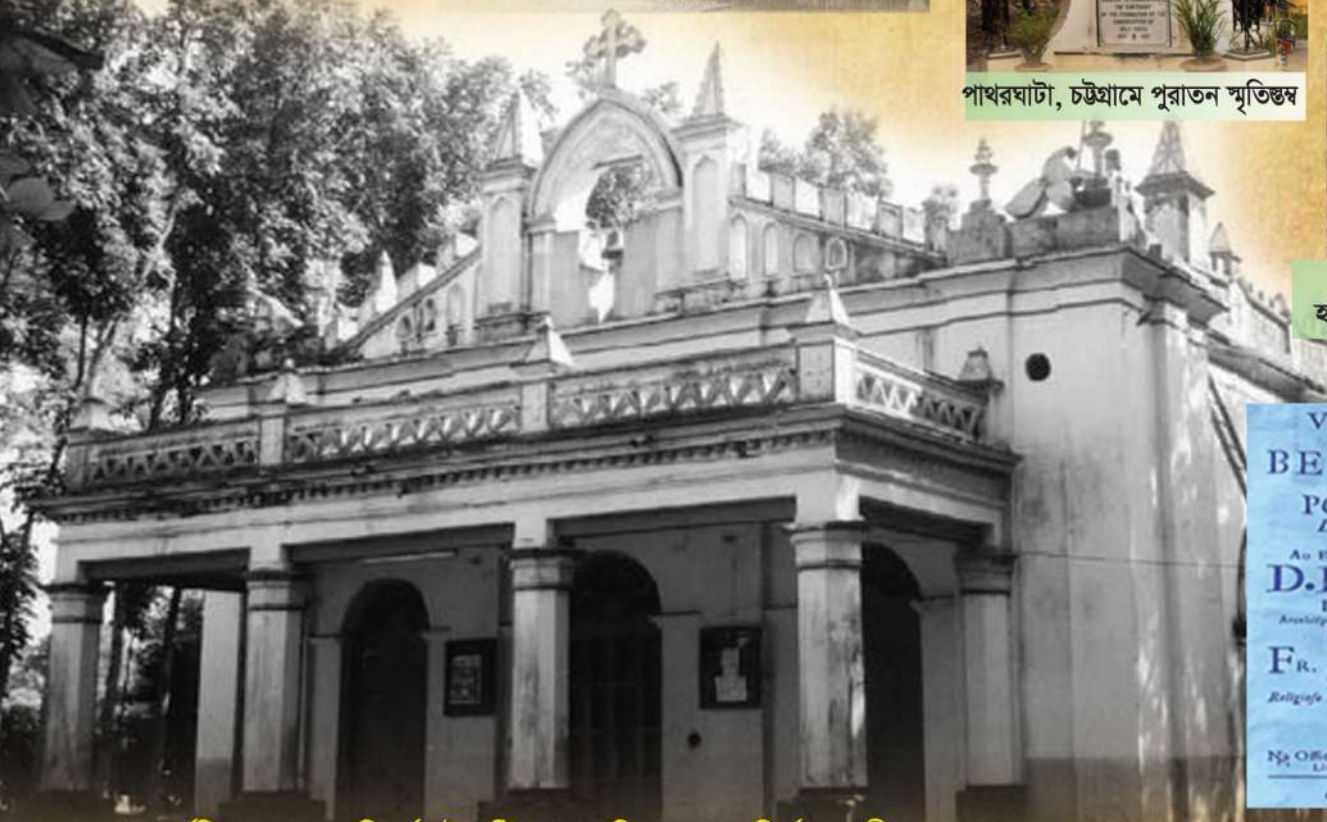

পর্তুগিজ স্থাপত্যের নিদর্শন টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাসের গির্জা, নাগরী

নাগরীতে রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

জেরোম সরকার

জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)
কনিষ্ঠ সন্তান : হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)
পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)
মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)

Our **H**ero
You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার ছোটদের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them, Who else do they need?
b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.
c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.
d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/নানার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য
ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা
মালা-মিঠু এবং আর্থার

বিজ্ঞ/১৬৩/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৬
২১ জুলাই - ২৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০৬ শ্রাবণ - ১২ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নিজেদের সঠিক ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি জানা এবং তা সংরক্ষণ করার এখনই সময়

উইকিপিডিয়ার মতে, অক্সফোর্ড অফ ইণ্ডিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সম্পর্কে কোন ধরণের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। দেশটির প্রারম্ভিক ইতিহাস হচ্ছে আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার ইতিহাস। ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে ইসলাম এদেশে প্রভাবশালী ধর্ম হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসকরা মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। মুঘলরা বেশ দীর্ঘ সময় এখানে রাজত্ব করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবাবরা স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র চালাতে থাকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ অঞ্চল দখল ও রাজত্ব শুরু করে। অনেক সংগ্রাম ও কঠিন পথ অতিক্রম করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উপমহাদেশ বেনিয়া ব্রিটিশদের কব্জা থেকে বেরিয়ে আসে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে। বাংলাদেশ ঐ সময়ে (পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে) পাকিস্তানের অংশ থাকে। ধর্মে এক হলেও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য থাকায় বাংলার মানুষ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে এবং রক্তক্ষয়ী ৯মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করে বিজয়। বিজয়ী এই জাতি আবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক নিয়ে। যে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের মধ্যদিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই আজ সম্মান ও সুবিধাবঞ্চিত। জীবনযুদ্ধে লড়ে কৃষিজীবী বঙ্গ সন্তান আজ পোষাকশিল্পী ও রেমিট্যান্স যোদ্ধা। দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সহজ-সরল গ্রামীণ ব্যক্তিও আজ শর্ট-কার্ট উন্নতি করতে চায়। দারিদ্র দূর বা সম্পদ অর্জন করতে দুর্নীতির সাথে মিতালি করা যেন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবেই উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি আমাদের গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল জীবনধারা ও কৃষ্টি সংস্কৃতি কেড়ে নিয়ে উপহার দিচ্ছে চটুল ও ভোগবাদী সংস্কৃতি।

বাংলার ইতিহাসের মতো বঙ্গে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস ততটা পুরাতন নয়। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে, দিয়াং-এ পতুর্গীজ খ্রিস্টানদের আগমন, বসতি ও ঘাঁটি স্থাপন শুরু করাসহ দীর্ঘ যাত্রার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ভারতে পর্তুগীজদের আগমনের পর থেকে প্রশাসনিকভাবে পর্তুগাল রাজ্যের শাসকমহল ও পোপের মধ্যে সম্পাদিত 'পাদ্রোয়াদো' চুক্তি অনুসারে মণ্ডলীর বাণীপ্রচারের কাজ চলতে থাকে। চুক্তি অনুসারে মিশনারী পাঠানো, মিশন এলাকা নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পর্তুগীজদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বেঙ্গল/বঙ্গ প্রথমে গোয়া ও কোচিন ডাইয়োসিসের অধীনস্ত ছিল এবং পরবর্তীতে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনে অবস্থান করে। এই সময়ে আগষ্টিনিয়ান সংঘের যাজকগণ দীর্ঘকাল বেঙ্গল এলাকায় বাণীপ্রচার করেন এবং তাদের পাশাপাশি প্রথমদিকে ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান এবং জেজুইট মিশনারীগণ বাণীপ্রচার কাজ ও পালকীয় দায়িত্ব পালন করতেন। পূর্ববঙ্গে তাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চট্টগ্রাম (দিয়াং), চান্দেকান (ঈশ্বরীপুর/যশোর), বাকলা ও পাদ্রীশিবপুর (বরিশাল), ভুলুয়া (নোয়াখালি), ভাওয়াল, হাসনাবাদ, শ্রীপুর, ঢাকা শহর প্রভৃতি এলাকায়। পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘ, পিমে, জেভেরিয়ান, সালেসিয়ান ও অবলেট সংঘ বাংলাদেশে মণ্ডলী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ধর্মসংঘের সাথে সাথে স্থানীয় যাজকগণ ও খ্রিস্টভক্তগণও বাণীপ্রচারে এবং জীবনসাক্ষ্যদানে পিছিয়ে ছিলেন না। কথিত আছে, দোম আন্তুনীও সাধু আন্তুনীর গানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টপ্রেমের কথা তুলে ধরতেন। পর্তুগীজসহ বিভিন্ন দেশের মিশনারীগণ বঙ্গে এসে শিক্ষা সেবাদানসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। প্রায় পাঁচশত বছরের গর্বিত ও ফলবন্ত ইতিহাসের চিহ্ন-প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কিছু গির্জা-গির্জিকা, কবরস্থান ও শিলালিপিসহ খ্রিস্টীয় জনপদে। কোন কোন অঞ্চলের রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও শব্দকোষ, নির্দিষ্ট খাদ্য ও পোষাক, গান ও নৃত্য ইত্যাদি। খ্রিস্টান জনপদের মঙ্গলবাণী প্রচার, ধর্মশিক্ষা গ্রহণ, জাতি-গোষ্ঠির ধরণ-ধারণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও নানাবিধ স্থাপনা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতার নথিপত্র, তথ্য, উপাত্ত বড়ই অপ্রতুল, দুষ্প্রাপ্য কিংবা বিলুপ্ত। তাই এখনই শুরু করতে হবে ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে আমরা অনেক খরচ করি কিন্তু গবেষণায় যত কার্পণ্য। গবেষণা কাজেও তেমন মানুষ এগিয়ে আসতে চাচ্ছে না। তাই যারা এখনও গবেষণা করতে চান তাদেরকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও মাণ্ডলীক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করা নৈতিক দায়িত্ব।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজের কোন কোন প্রতিষ্ঠান ও ধর্মপল্লীতে ভূল তথ্য সন্নিবেষ্টিত কিছু তালিকা জনসন্মুখে প্রদর্শিত হচ্ছে। যথাযথ স্থান ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যাচাই-বাছাই করে কোন কিছু প্রকাশ করা দরকার। নিজের কর্ম তুলে ধরা নয় বা নিজের মত প্রকাশ করা নয়। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছে তা সংরক্ষিত রাখাই একটি বড় কাজ। দৈনিক দিনপুঞ্জিই এক সময়ে সঠিক ইতিহাসের কথা বলবে। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক তথ্য জানানোর জন্য দিনপুঞ্জি বা ঘটনাক্রম লিপিবদ্ধ করার বিকল্প নেই। আর তাই তা শুরু করি আজ থেকেই যাতে করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিড়ম্বনায় পড়তে না হয়। †

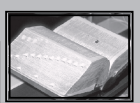

তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন; তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। (মার্ক ৬:৩৪)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২১ জুলাই - ২৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২১ জুলাই, রবিবার
যেরে ২৩: ১-৬, সাম ২৩: ১-৬, এফে ২: ১৩-১৮, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

২২ জুলাই, সোমবার
সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা, *পর্ব*
পরম ৩: ১-৪ক (বিকল্প: ২ করি ৫: ১৪-১৭), সাম ৬৩: ১-৫, ৭-৮, যোহন ২০: ১-২, ১১-১৮

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার
সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজেট, সন্ন্যাসব্রতী
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ৮৫: ১-৭, মথি ১২: ৪৬-৫০

২৪ জুলাই, বুধবার
সাধু শার্বেল মাখ্লুফ, যাজক
সাধ্বী খ্রীষ্টিনা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
যেরে ১: ১, ৪-১০, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, মথি ১৩: ১-৯

২৫ জুলাই,বৃহস্পতিবার
সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত, *পর্ব*
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ২০: ২০-২৮

২৬ জুলাই, শুক্রবার
সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না, ধন্যা কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা, *স্মরণদিবস*
যেরে ৩: ১৪-১৭, সাম যেরে ৩১: ১০-১৩, মথি ১৩: ১৮-২৩
অথবা সিরাখ ৪৪: ১, ১০-১৫, সাম ১৩২: ১১, ১৩-১৪, ১৭-১৮, মথি ১৩: ১১ক, ১৬-১৭

২৭ জুলাই, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
যেরে ৭: ১-১১, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, ১০, মথি ১৩: ২৪-৩০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২১ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৯৯ সি. মেরী এলিজাবেথ, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ জুলাই,সোমবার
+ ২০০৫ সি. মেরী সেলিন রিবেরু, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. মেরী কনসেপ্তা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ২০২০ সি. জ্যোৎস্না আল্পনা, আরএনডিএম (ঢাকা)

২৪ জুলাই, বুধবার
+ ২০১৫ ফা. বকুল এস. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ জুলাই,বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৪ ফা. থোমাসো কাত্তানেও (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ফা. জন কেইন, সিএসসি (ঢাকা)

২৬ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৬৩ ব্রা. গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৭ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৫৬ সি. মেরী বার্টিল, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ডেজমন্ড ও'হারা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফ মেরী, সিএসসি (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

ধারা - ৬

নীতিবোধসম্পন্ন বিবেক

১৭৭৬ "নিজের বিবেকের অন্তর-গভীরে মানুষ এমন একটি নীতি-নিয়ম দেখতে পায়, যা সে নিজে নিজের জন্য প্রণয়ন করেনি, অথচ তা পালন করতে সে বাধ্য। বিবেকের কণ্ঠস্বর, সবসময় মানুষকে আহ্বান করে যা-কিছু মন্দ তা পরিহার করতে, এবং যা-কিছু মঙ্গল তা ভালবাসতে ও তা করতে, সঠিক সময়ে অন্তরে শোনা যায়। স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের হৃদয়পটে এই নিয়ম লিখে দিয়েছেন। মানুষের বিবেকেই হচ্ছে তার গোপনতম সত্তা এবং তার পুণ্যস্থান। সেখানে সে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে থাকে যার কণ্ঠস্বর তার অন্তর-গভীরে ধ্বনিত হয়।"

॥ ক ॥ বিবেকের বিচারশক্তি

১৭৭৭ নীতিবোধসম্পন্ন বিবেক, ব্যক্তির অন্তরে যার অবস্থান, সঠিক মুহূর্তে, যা-কিছু ভাল তা করতে ও যা-কিছু মন্দ তা পরিহার করতে মানুষের সঙ্গী হয়। তাছাড়া এই বিবেক নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তগুলো বিচার করে, যা-কিছু ভাল তার সমর্থন করে এবং যা-কিছু মন্দ তার প্রতি অস্বীকৃতি জানায়। বিবেক সাক্ষ্যদান করে সেই সত্যের অধিকার সম্বন্ধে, যা পরম-মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যার দিকে প্রত্যেক মানবব্যক্তি আকৃষ্ট; এবং বিবেক আজ্ঞাসমূহ শ্রবণ করে। বিচক্ষণ মানুষ যখন বিবেকের কথা শোনে, তখন সে শুনতে পায় ঈশ্বরেরই কথা।

১৭৭৮ বিবেক হল বুদ্ধির বিচারশক্তি যার মাধ্যমে মানবব্যক্তি যে-ক্রিয়া সম্পাদন করতে যাচ্ছে, বা সম্পাদন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, অথবা ইতিমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে, সেই বাস্তব ক্রিয়ার নৈতিকতা বুঝতে পারে। মানুষ যা-কিছু বলে ও করে, সব কিছুর মধ্যে যা ন্যায় ও সঠিক জানে, তা সে বিশ্বস্তভাবে মেনে চলতে বাধ্য। বিবেকের বিচারের মধ্য দিয়েই মানুষ ঐশবিধানের নির্দেশ আবিষ্কার করে ও তা জানতে পারে:

বিবেক হ'ল মনের একটি নিয়ম; তা সত্ত্বেও (খ্রীষ্টানগণ) একথা মেনে নেবে না যে, এর চাইতে আরও অধিক কিছু নেই; অর্থাৎ বিবেক কেবল এককভাবে নির্দেশ দেয়, দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যবোধ, কোন হুমকি এবং প্রতিশ্রুতির ধারণা জ্ঞাপন করে। (বিবেক) হ'ল তাঁরই দূত, যিনি তাঁর প্রকৃতি ও অনুগ্রহ উভয়ের মাধ্যমে, পর্দার অন্তরালে থেকে আমাদের নিকট কথা বলেন, শিক্ষা দেন এবং তার প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদেরকে পরিচালনা করেন। বিবেক হল খ্রীষ্টের আদিম প্রতিনিধি।

১৭৭৯ প্রত্যেক ব্যক্তিকে, তার নিজের মধ্যে সতর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেন সে আপন বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও তা সে মেনে চলতে পারে। অন্তর-জীবনের এই দাবিটি আরও বেশী প্রয়োজন, কারণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা আমাদেরকে ধ্যান, আত্ম-পরীক্ষা বা অন্তর্দৃষ্টি থেকে বিক্ষিপ্ত করে:

তোমার বিবেকের কাছে ফিরে যাও, তাকে প্রশ্ন কর....। ভাইয়েরা, ভিতরের দিকে ফের, এবং যা- কিছুই কর তার মধ্যে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে কর।

১৭৮০ মানবব্যক্তির মর্যাদার অর্থ ও দাবি হচ্ছে সঠিক নীতিবোধসম্পন্ন বিবেক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেকের অন্তর্ভুক্ত: নৈতিকতার নীতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান (synderesis); নিজস্ব পরিস্থিতিতে, কারণ ও মঙ্গলসমূহের বাস্তব অবধারণ দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহে তার প্রয়োগ; এবং পরিশেষে, ভাবী ক্রিয়া অথবা ইতিমধ্যে সম্পাদিত বাস্তব ক্রিয়ার ভাল-মন্দ বিচার করা। নৈতিক মঙ্গল সম্পর্কিত সত্য, যুক্তিবিধানে যা বিধৃত, তা ব্যবহারিকভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে সনাক্ত করা হয় বিবেকের সদ্‌বিবেচক বিচারশক্তির দ্বারা। যে ব্যক্তি এরূপ বিচার অনুসরণ ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই ব্যক্তিকে সুবিবেচক ব্যক্তি বলা যায়।

ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল

সাধারণ কালের ১৭শ রবিবার

১ম পাঠ : ২য় রাজাবলি ৪:৪২-৪৪ পদ
২য় পাঠ : এফেসীয় ৪: ১-৬ পদ
মঙ্গলসমাচার : যোহন ৬:১-১৫ পদ

ভূমিকা: আমি অকৃতি অধম বলেওতো কিছু কম করে মোরে দাওনি; যা দিয়েছো তাঁরই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি। সত্যিই সর্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে সৃষ্ট মানবজাতির সর্বদাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এই ভেবে যে, তিনি আমাদের কোন প্রকার সৃষ্টির জন্য জাগতিক বা আত্মিক সম্পদ কম করে দেননি। পেট ভরে খাবার জন্য সম্পদ দিয়েছেন আবার খ্রিস্টের মাধ্যমে আত্মার তৃষ্ণা মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন সংকটের মধ্যে আমরা থাকি, তবে তা আমাদের পাপ, অহংকার এবং স্বার্থান্বেষী স্বভাবের কারণেই ডেকে আনি।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে লাগাতার দুর্ভিক্ষ: প্রথম শাস্ত্রপাঠে ইস্রায়েল দেশের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বাস্তব জীবন ও জগতে দেখা যায় যে, ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র সকলের মধ্যেই লাগাতার দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। যারা ধনী তাদের মধ্যে আরও ধনী হওয়ার দুর্ভিক্ষের নেশা কাজ করছে; মধ্যবিত্তদের মধ্যে আরো ধনী হবার দুর্ভিক্ষ কাজ করছে এবং একইভাবে দরিদ্রদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং হয়তো মধ্যবিত্ত পর্যায়ে যাবার জন্য তারা দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। এমনিভাবেই জগত জুড়ে সবার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। এই বড় পরিসরের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রগুলি মানুষের লোভ, লালসা, পাপ, অহংকার এবং স্বার্থান্বেষী চিন্তাভাবনার কারণে হয়ে থাকে। বস্তুত ঈশ্বর কিন্তু আমাদের এমন অবস্থায় রাখতে চাননি। তিনি ঈশ্বর এই পৃথিবী ভরপুর সম্পদ দিয়েছেন কোন কিছুই কম করে তিনি দেননি, কোন মানুষ কোন পশু পাখি না খেয়ে থাকার মত অবস্থায় তিনি রাখেননি। সবাই পেট ভরে খেতে পারবে বাইবেল জুড়ে এমনই আশ্বাস পাওয়া যায়। শুধু বলার মানুষ নেই যে, "যা আছে নিয়ে আসো তো, তোমাদের মধ্যে কি আছে? খাবারের জন্য বসতে বল," ইত্যাদি বাক্যগুলো বলার জন্য। বিপরীতে "আমি পাইনি, আমাকে দাও, এই কোথায় আগে দেওয়া উচিত" ইত্যাদি কথাগুলি ক্রমে ক্রমে বর্জন করে একত্রিত সহভাগিতায় পরিপূর্ণ যোগান দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আমাদের সকলের।

নতুন ফসল উৎসর্গের রীতি: কেইন এবং আবেলের ফসল উৎসর্গের রীতি-নীতি থেকে শুরু করে বাইবেলের প্রতিটি পুস্তকে এই উৎসর্গের রীতি লক্ষণীয়। আমার ছোটবেলায় গ্রামের উপাসনায় যোগ দিয়ে দেখতে পেতাম, যারা উপাসনার পরে দৈনিক বাজার-ঘাট করতে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়ে আসতেন, তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত বাজারে যেতে হতো না কারণ বিভিন্ন ধরনের শস্য, চাল, ডাল, দুধ, ডিম, নারিকেল ইত্যাদি উপাসনার সময় নিয়ে আসতো এবং সেখান থেকেই উৎসর্গের দরদামে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো।

বর্তমান কালে কদাচিৎ চোখে পড়ে মানুষ তাদের নতুন ফসলের বা আয়ের দশম অংশ উপাসনায় নিয়ে এসেছে। ঘরের দলিল পত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাবে যে, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা দাদী, যারা এইসব উৎসর্গ দান করতেন তাদের একার অর্জিত সম্পত্তি বর্তমানে দশ বিশ জনে খাচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে যারা স্বার্থপরতার অন্তর নিয়ে আত্মসাৎ করার চিন্তা ভাবনা নিয়ে সম্পদ রচনা করছে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু যারা ঈশ্বরকে উদারভাবে দিয়েছে তাদের ঈশ্বর উদারভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে ধনশালী করে দিয়েছেন। উদার প্রভুর মতো দিনে দিনে আমাদের উদার হতে হবে।

আদি থেকে সর্বযুগের মানুষ পেট ভরেই খাবে: ইদানিং কারো কারো মুখে শোনা যায়, মিশনে এত টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ দরকার কেন? তাদের টাকা কি শুকিয়ে গেছে? মিশনে বসে শুধু চাঁদাবাজি ইত্যাদি। আসলে কেবলমাত্র ধর্মহীন মানুষ এইসব উক্তি করে থাকেন। কারণ যারা ঈশ্বর ভীতি এবং ধার্মিকতা চর্চা করে, তারা জানেন যে, চার্চ বা ধর্ম কখনো ইনকাম করে না। বরং মানুষের দান, উৎসর্গ, মানত ইত্যাদি দিয়েই ধর্মের কাজ চলেছে এবং চলবে। এই দান প্রক্রিয়াটি ঈশ্বরের ঘোষিত, বাইবেলে উল্লেখিত, এবং মিশনে অনুশীলনকৃত। ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে এই বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করতে হয়। মূল কথা হলো: আমাদের মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক দানশীলতাই সকল চাহিদা পূরণ করে, সেটা মিশনে হোক কিংবা পারস্পরিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে হোক, এটি আমাদের পৃথিবীকে দুর্ভিক্ষ মুক্ত রাখতে একমাত্র সহায়ক উপায় এবং এ উপায়েই আদি থেকে সর্বযুগের মানুষ এভাবে পেট ভরে খেতে পারবে। কারণ ঈশ্বর নিজেই এ কথা বলেন, "তারা খাবে আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।"

প্রতিটি মহাপর্বের খরচের যোগানদাতা যিশু: পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াবার পূর্বে একটি পরিবেশ লক্ষণীয় যে, সেখানে ইহুদিদের মহাপর্বের আয়োজন চলছে। বিভিন্ন মহাপর্বের আয়োজন করতে গেলে মানুষ একটু হিমশিম খাবে এটাই স্বাভাবিক। এই হিমশিম সংকট মোকাবেলায় আশ্বাস দেওয়ার জন্য যিশু একটি আশ্চর্য কাজের উপস্থাপন করেন। সেখানেই তিনি প্রমাণ করেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে ভরসা করে আমরা যে কোন সংকট মোকাবেলা করতে পারি। শুধু আমাদের দরকার সবাইকে উদারভাবে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে বিশ্বাস এবং সামান্য সহযোগিতা।

ছোট ছেলে কর্তৃক আশ্চর্য কাজ: আমরা ভাবতে পারি আমাদের বর্তমান সংকট পূরণের জন্য যদি যিশুখ্রিস্ট উপস্থিত থাকতেন তাহলে এভাবে অনায়াসে ৫ হাজার, ১০ হাজার মানুষকে পেট ভরে খাবার যোগান দেওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে যিশু ওই একটা ভোজের জন্য আশ্চর্য কাজের ঘটনা ঘটাননি। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ওই আশ্চর্য কাজ স্মরণ করে নতুন আরো কয়েকটি আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করতে পারি। এজন্য যিশুর অনুগ্রহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, শুধু বাকি থাকে সহভাগিতা। আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে, যিশু আশ্চর্য কাজ করতেন না, যদি না শিশুটি বা ক্ষুদ্র দানের পাঁচখানা রুটি এবং দুটি মাছ দিয়ে সহযোগিতা কেউ না করতো।

বর্তমানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে অন্তত দু'বেলা ভাত খায় না। এই অবস্থায় আজকে আমরা যদি একটি মহাপর্বের আয়োজন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে প্রথমেই যিশুর অনুগ্রহ যাঞ্চা করে ৫০০০ শিশু বা ক্ষুদ্রজনের কাছে যাই।

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

বিশ্বাসের গভীরতায় বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর পথচলা .....

এলড্রিক বিশ্বাস

ভূমিকা: ঈশ্বর পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্টের যারা অনুসারী তাদেরকেই খ্রিস্ট বিশ্বাসী বা খ্রিস্টান বলা হয়। খ্রিস্টানগণ যিশু খ্রিস্টের আদর্শ এবং তাঁর প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করেন। যিশু খ্রিস্টের আদর্শ, শিক্ষা এবং প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে বিস্তারিত বলা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ। যিশু খ্রিস্ট এখন থেকে ২০২৪ বছর আগে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাস ৫০০ বৎসরের অধিক। এদেশের জনপদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এই খ্রিস্টান সম্প্রদায়। এদেশেরই আলো, বাতাস এবং মাটিতে তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং বসবাস। ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্যকোন দেশ থেকে আসা মানুষ তারা নয়, সকলেই বাঙালি।

ভারতে খ্রিস্টধর্মের গোড়াপত্তন : ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যিশু খ্রিস্টের ১২জন শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং ৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদ হন। এ সময়ের মধ্যে তিনি স্থানীয় কিছু ইহুদী, অগ্নিউপাসক ও সনাতনধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৭টি গির্জা স্থাপন করেন বলেও জানা যায়।

পর্তুগীজদের আগমন ও বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার: উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পর্তুগীজদের আগমনের দ্বার উন্মুক্ত করেন। পর্তুগীজ বসতিস্থাপনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে এই বঙ্গদেশে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের আগমন ও খ্রিস্ট বিশ্বাসের পথ চলা শুরু হয়। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা বর্তমান ভারতের হুগলীর নিকটবর্তী সাতগাঁও ও চট্টগ্রামে বসবাস এবং শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমোদন লাভ করেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর তাদেরকে বঙ্গদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজরাই হলেন বাংলার প্রথম খ্রিস্টান, প্রথম দেশীয় খ্রিস্টানরা হলেন তাদের বংশধর এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টবিশ্বাসের বিস্তার লাভের মাধ্যমে খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর বয়সকাল ৫০০ বৎসর হলেও অপরদিকে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী সমূহের বয়স ২০০ বৎসরেরও কিছু বেশি সময়কাল।

বাংলাদেশের বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অর্ন্তগত চান্দিকান বা ঈশ্বরীপুরে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম একটি কাথলিক গির্জা নির্মিত হয়, যার নাম 'Holy Name of Jesus'। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মিত হয় চট্টগ্রামে, যার নাম 'Saint John the Baptist Church'. ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম পর্তুগীজ আগষ্টিনিয়ান পুরোহিতগণ খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরু করেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নারিন্দায় একটি গির্জা নির্মিত হয় যার নাম রাখা হয় 'Church of the Assumption'। ঢাকার ঐতিহাসিক তেজগাঁও গির্জা ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এছাড়া বর্তমান গাজীপুর জেলার নাগরীতে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকার নবাবগঞ্জের হাসনাবাদে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং বরিশালের পাদ্রীশিবপুরে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি করে গির্জা নির্মিত হয়েছিল।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাদেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ভিত প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন। ১৬৬৩-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে খ্রিস্ট ধর্মের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার ঈশ্বরীপুরে জেজুইট মিশনারীদের দ্বারা নির্মিত প্রথম গির্জাটির ধ্বংসাবশেষের কথা এখনো শোনা যায়।

বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মিশনারী মণীষীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তার নাম ড. উইলিয়াম কেরী। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় আসেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবৈতনিক দৈনিক পাঠশালা খুলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের জন্য মদনাবটিতে ১টি ও রামপাল দীঘিতে ১টি কলেজ স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের গদ্য অনুবাদ করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম বাংলায় অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন। ড. কেরী ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একখান ছাপাখানা স্থাপন করেন ও ছাপার মান উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি শ্রীরামপুরে একটি কলেজও স্থাপন করেন। ড. কেরী ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর একজন নিবেদিত প্রাণ প্রচারক।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে Baptist Missionary Society (British), ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে Church Missionary Society (British), 1852 খ্রিস্টাব্দে Council for World Mission (British Pressbyterian) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী সমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী

'কাথলিক' শব্দের অর্থ 'সার্বজনীন' এবং 'মণ্ডলী' অর্থ জনগণের সমাহার বা চার্চ। কাথ লিক মণ্ডলী বলতে বুঝায় 'সার্বজনীন চার্চ'। কাথলিক মণ্ডলী হল বিশ্বের মূলধারার খ্রিস্টীয় সমাজ। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস হলেন বিশ্বের কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু। বিশ্বের কাথলিক মণ্ডলী পরিচালনার কেন্দ্রস্থল হল রোমের সার্বভৌম ভাটিকান সিটি। বর্তমানে বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর বিস্তৃতি ৮টি ধর্মপ্রদেশে (Diocese)। বাংলাদেশের খ্রিস্টান জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এই কাথলিক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ : ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা ধর্মপ্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই ঢাকা-কে মহাধর্মপ্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়। এ মহাধর্মপ্রদেশের দায়িত্বে আছেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও সহকারী বিশপ হিসেবে আছেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিস : ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের দায়িত্বে আছেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি ।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ : ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে এই ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়। এ ধর্মপ্রদেশের বর্তমান বিশপ হলেন পরম শ্রদ্ধেয় সেবাষ্টিয়ান টুডু।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি এ ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়। এ ধর্মপ্রদেশের বর্তমান বিশপের নাম পরম শ্রদ্ধেয় জেমস রমেন বৈরাগী।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ : ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর এ ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়। এ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় পনেন পল কুবি সিএসসি।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ : ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর এ ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়। এ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয়

জের্ভাস রোজারিও।

সিলেট ধর্মপ্রদেশ : ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই এই ধর্মপ্রদেশ গঠিত হয়। বর্তমানে এ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ : ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে এই ধর্মপ্রদেশ গঠিত হয়। বর্তমানে এ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও।

৮টি ধর্মপ্রদেশের সকল বিশপকে নিয়ে 'বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী' বা Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB) গঠিত। কাথলিক মণ্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশপ সম্মিলনীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল বিশপগণই বাংলাদেশী।

খ্রিস্টান জনসংখ্যা: বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জন সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক হবে। কাথ লিক চার্চ বা ধর্মপল্লী ১০০টি, উপ-ধর্মপল্লী ৪৩ টি, খ্রিস্টান জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৯৫ শতাংশের অধিক। খ্রিস্টান জনগণের প্রায় ৫৫ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠি ভুক্ত। (অসমর্থিত সূত্র)

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সমাজের অবদান

শিল্প ও সাহিত্যে : বাংলা সাহিত্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগীজ ফাদার মানুয়েল দ্যা এসানসাও কৃপা শাস্ত্রের অর্থবেদ রচনা করেন, যা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিস্বনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। তিনি ৪০ পাতার বাংলা ব্যাকরণ বই; ৫২৯ পাতার বাংলা-পর্তুগীজ,পর্তুগীজ-বাংলা অভিধান রচনা করেছিলেন। এই বই পর্তুগালের লিসবনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী, ড. উইলিয়াম কেরী ইংরেজী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, বিভিন্ন প্রকার বই এবং অভিধান রচনা করেছিলেন বাংলায়। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা মুদ্রণ হরফ তৈরি করে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ করেন। তিনি ৪০টি ভাষায় খ্রিস্টধর্মের বই প্রকাশ করেন। ফাদার মারিনো রিগন এবং সিলভানো গারেল্লো বিভিন্ন প্রকার বই-এর অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন। কাথ লিক চার্চের মুখপত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ৮৪ বছর যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম কাথিড্রাল চার্চের মুখপত্র সেবক ও গ্লিনিংস প্রকাশিত হচ্ছে ৫০ বছর যাবৎ। এছাড়াও বিভিন্ন খ্রিস্টান লেখক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন। স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক প্রয়াত সমর দাস, একুশে পদক প্রাপ্ত প্রয়াত ওস্তাদ পি.সি. গমেজ, প্রয়াত কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর, যোসেফ কমল রড্রিক্স, অনিমা মুক্তি গমেজ, অনিমা ডি' কস্তা, আইরিন সাহা, গীটার শিল্পী কিশোর ডি' কস্তা, গীতিকার লিটন অধিকারী রিন্টুসহ আরও অনেকে অবদান রেখেছেন এবং এখনও রেখে চলেছেন। জাতীয় পর্যায়ে অভিনয়ে টনি ডায়েস-এর নামও উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধে : বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে খ্রিস্টান জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কয়েকজন পুরোহিতসহ অনেক খ্রিস্টভক্ত শহীদ হয়েছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম-শহীদ ফাদার মারিও ভেরনিসি (ইতালিয়ান), শহীদ ফাদার লুকাস মারাণ্ডী, শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স (আমেরিকান), শহীদ সিস্টার ইম্মানুয়েল, শহীদ পল স্বপন কুমার বিশ্বাস, শহীদ প্রকাশ বিশ্বাস, শহীদ অনিল সরদার, শহীদ মিসেস ফুলকুমারী তরফদার, শহীদ মগদেলিনা তরফদার, শহীদ পবিত্র বিশ্বাস, শহীদ অনিল মান্দা, শহীদ পরিমল দ্রং, শহীদ আরং রিছিল, শহীদ হিউবার্ট অনিল সুমন্তি, শহীদ পরেশ চন্দ্র গাইন, শহীদ টমাস আশীষ ব্যাপারী, শহীদ আন্তনী পিউরীফিকেশন, শহীদ আগষ্টিন পেরেরা, শহীদ রবি ডি কস্তা, শহীদ রেজিনাল্ড গমেজ, শহীদ অনীল কস্তা, শহীদ সুভাষ বিশ্বাস, শহীদ খোকন সলোমন পিউরীফিকেশন, শহীদ আশীষ ব্যাপারী, শহীদ খ্রীষ্টফার ডি' সিলভা, শহীদ সিলভেস্টার গনসালভেস ও নাম না জানা আরো অনেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রামগুলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। সহস্রাধিক খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মিশনারী পুরোহিত ও খ্রিস্টভক্তরা সংখ্যালঘু বিভিন্ন পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করেছে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিব নগরে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে ভবরপাড়া কাথলিক চার্চের আসবাবপত্র-সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। তৎকালীন মেহেরপুর কাথলিক চার্চের ফাদার এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ ফ্রান্সিস এ, গমেজ অস্থায়ী সরকার গঠনে সহায়তা করেছিলেন। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী, সুরকার সমর দাস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত-উদীপ্ত করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ গড়ার কাজে খ্রিস্টান সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে: সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মিশনারীজ অব চ্যারিটিসহ বিভিন্ন চার্চের সেবাধর্মী প্রকল্পগুলো দেশের মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন, পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতে কাজ করছে কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সিসিডিবিসহ আরও অনেক বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং মানবাধিকার আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম সিএসসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কারিতাস বাংলাদেশ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও এখন মিয়ানমার এর রাখাইন রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত ক্যাম্পে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। কারিতাস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল লুইস আন্তুনীয় তাগলে, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি এবং কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে : শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের অবদান ধ্রুব তারার মতই। খ্রিস্টান মিশানারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের আপামর জনগণের ভূয়সী প্রশংসা এবং আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ঢাকার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়, নটরডেম কলেজ, হলিক্রশ কলেজ, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল ও কলেজ, সেন্ট প্ল্যাসিডস্ স্কুল ও কলেজ, সেন্ট স্কলাস্টিকেট স্কুল ও কলেজসহ দেশের বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চলে পরিচালিত মিশনারী স্কুলগুলো অত্যন্ত মানসম্মত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম রক্ষা করে চলছে।

স্বাস্থ্য সেবা খাতে : স্বাস্থ্য সেবা খাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। নার্সিং সেবায় বাংলাদেশে খ্রিস্টান মেয়েরা অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে বর্তমানে এ পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দিনাজপুরের সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, যশোরের ফাতেমা হাসপাতাল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সেন্ট ভিয়ানী হাসপাতাল, ক্রেডিটের ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল, চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা ও মালুমঘাটের মিশনারী হাসপাতাল, রাজশাহী, হালুয়াঘাট, পূবাইলের করমতলাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালগুলো মানসম্মত ও নির্ভেজাল সেবা প্রদান করছে দেশের আপামর জনগণকে।

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয়ান জনপদ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ড. ইসিদোর গমেজ

নদীবিধৌত আমাদের এই বঙ্গভুমিতে গ্রাম শহর বন্দর বিলীন বা হারিয়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সুনির্দিষ্ট একটি ভূ-খণ্ডের মানচিত্র শত বছর, এমন কি কয়েক বছরের ব্যবধানে কত পরিবর্তন হয় তা আমাদের দেশের মানচিত্র বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। এই যে পরিবর্তন তার প্রধান করণ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় -নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্পের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ভূমিধ্বস, প্লাবন ইত্যাদি।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর আগে থেকে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের ভৌগলিক সীমানার বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামে ও বন্দরে খ্রিস্টান বসতি গড়ে উঠেছিল। সময়ের বিবর্তনে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে তাদের অনেকগুলো হারিয়ে গেছে।

জুলিয়ান এ. গোমেজ রচিত পুস্তক "তিনশো বছর আগে (১৯৬৬)"; যেরোম ডি' কস্তা লিখিত "বাংলাদেশে ক্যাথলিক মণ্ডলী (১৯৮৮)"; জে জে এ কামপোস লিখিত "হিসটোরী অফ পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল (১৯১৯)"; লুইস প্রভাত সরকার রচিত "বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়" প্রথম খন্ড (২০০২) পুস্তকগুলিতে অনেকগুলো স্থানের নাম উল্লেখ আছে যেখানে দূর অতীতে খ্রিস্টান জনবসতি ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, লরিকুল, চন্ডিপুর, ভুলুয়া, বিক্রমপুরের শ্রীপুর, কাত্রাবো, ভুষণা রাজ্যের কোষাভাঙ্গা, ধর্মনগর, তেলিহাটী; উসমপুর বা হোসেনপুর, মুন্সিগঞ্জের ফিরিঙ্গী বাজার, সাভারের ফিরিঙ্গীকান্দা ও মুশুরীখোলা, ফরিদপুরের (ঢাকা) মাহমুদপুর ও আমিরাবাদ ইতাদি।

অপরদিকে এমন কয়েকটি স্থান আছে যেখানে নিকট অতীতেও খ্রিস্টীয়ান বসতি ছিল। যেমন- মেঘুলা, মালিকান্দা, ঝন্‌কি, সুতারপাড়া, নারিশা, নাগেরকান্দা, নটাখোলা, চরকুশাই, জামালচর, হরিচন্ডি, ধাপারী, মাঝিরকান্দা, সাদাপুর, ইত্যাদি।

বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে একজন যুগান্তকারী ব্যক্তির নাম দোম আন্তনীয়। কথিত আছে তিনি মাত্র তিন বছরে পঁচিশ/ত্রিশ হাজার মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ১৬৮০/১৬৯০ সময়কালে ৬৪ টি গ্রামের তালিকা পাওয়া যায় যেখানে খ্রিস্টানরা বাস করতো। আমি জুলিয়ান এ গোমেজ এর পুস্তকের কিছু অংশ উদ্বৃত করছি।

"আন্তনীয়র কার্যকলাপের কথা চারিদিকের খ্রিষ্টান মহলে এক উত্তেজনা এনে দিলো। আগ্রা থেকে ফাদার মাগালহেস্ এলেন স্বচক্ষে তাঁর কার্যকলাপ দেখার জন্য। প্রথম কথাবার্তাতেই তিনি বুঝলেন, আন্তোনীয় ভগবানেরই কাজ করছেন। তারপর তিনি আন্তনীয়কে অনুরোধ করলেন নতুন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের দেখাতে। এই ফাদারের লেখা চিঠি থেকে সেকালের অনেক নতুন খ্রিষ্টান বসতি-স্থানের কথা জানা যায়।"

তিনি খ্রিস্টান গ্রামগুলোর নাম ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা দিয়েছিলেন। আমি এখানে শুধু গ্রামের নাম উল্লেখ করছি। ১. আকিমপুর, ২. জসোউ, ৩. সেরয়, ৪. দাপা, ৫. গেদারপুর, ৬. কদমতলি, ৭.পঙ্গা, ৮. সোরাহি, ৯. দিউরা, ১০. আত্তাবো, ১১. করদোটম্‌বো, ১২. রইলা, ১৩. বেলদির, ১৪. আন্দিয়া, ১৫. কারাতিয়া, ১৬. মিরাবো, ১৭. সোম, ১৮. গানান, ১৯. বান্দাকোলা, ২০. বদরতি, ২১. বরণা, ২২. কোইর, ২৩. কোরাণ, ২৪. ওতোরকান, ২৫. পোসী, ২৬. এসিমপুর, ২৭.কুমুতকলা, ২৮. মনছিপুর, ২৯. মছিমপুর, ৩০. সাগরদি, ৩১. মাসদিয়া, ৩২. করিসে, ৩৩. আলজো, ৩৪. সিরাত ও আশেপাশের গ্রাম, ৩৫. আগাকাসতোল, ৩৬. বালদাকাল, ৩৭. মসুয়াকাল, ৩৮. সোরারগান (সোনারগাঁও ?), ৩৯. চাঁদপুর-চিতুলিয়া, ৪০. সাবাপুর, ৪১. সোনগান, ৪২. বুলিকা, ৪৩. সিমোলিয়া, ৪৪. পেবত দি, ৪৫. বামনদি, ৪৬. গায়দিয়া, ৪৭. আতারৌকানিয়া, ৪৮. বান্দাসনা, ৪৯. গোসারিয়া, ৫০. পানছিয়া, ৫১. আগারাজন্দা, ৫২. দোগদাগা, ৫৩. সারোয়া, ৫৪. সোনোতিয়া, ৫৫. উষাভালো (ভাওয়াল?), ৫৬. বামপুর, ৫৭. মিজারপুর, ৫৮. মজদিয়া, ৫৯. দালিল, ৬০. মাসিদিয়া, ৬১. সাউরাল, ৬২. গোরাঘাট, ৬৩. বোরোইতলা, ৬৪. রাঙ্গামটি।

মাননীয় ফাদার স্বাভাবিকভাবেই নামগুলিকে একটু বিকৃত করে ফেলেছেন। যার ফলে বিভিন্ন স্থানগুলিকে ঠিকমত চেনা যায় না। ঐ গ্রামগুলি বর্তমানে কি নামে চলছে, বা আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না তা বলা কঠিন। শুধু এইটুকু বলা যায় নিঃসন্দেহে যে, গ্রামগুলি ছিলো ঢাকার কাছাকাছি এবং নদীর ধারে। কারণ আন্তনীয়র সঙ্গে বের হবার আগে তিনি লরিকুল ও চাঁদপুরেও গিয়েছিলেন সেখান থেকে তাঁরা নৌকা করে বেড়াতে থাকেন।

এবার হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি খ্রিস্টীয়

জনপদ সম্পর্কে কিছু জানা যাক। যেমন- লরিকুল (নরিকুল), শ্রীপুর, চন্ডীপুর, ভুলুয়া, ভূষণা, কোষাভাঙ্গা-ধর্মনগর, তেলিহাটি, মেঘুলা-মালিকান্দা-ঝনকি-সুতারপাড়া, নারিশা, নাগেরকান্দা, ফিরিঙ্গীবাজার, ফিরিঙ্গীকান্দা, মুশুরীখোলা, ধাপারী, সাদাপুর গ্রামগুলোর অবস্থান কোথায় ও কেমন ছিল।

শ্রীপুরঃ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার (বিক্রমপুরের) পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর নগর সংলগ্ন পোতাশ্রয়ে পর্তুগীজগণ নিজেদের জাহাজ মেরামত করত। একসময় (১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) শ্রীপুর সম্পূর্ণরূপে পর্তুগীজদের অধীনে ছিল এবং তাদের বসতি ছিল। কথিত আছে তখন সেখানে পর্তুগীজ ভাষায় কথোপোকথন হতো। আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে জেজুইট ফাদার ফারনানদেজের কাছ থেকে শ্রীপুরের খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীপুরে পর্তুগীজদের সাথে সেখানে কর্মরত নেটিভ (বাঙ্গালী) ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানরাও বসবাস করতো। এই শ্রীপুরেরই এক সন্তান (নেটিভ) পুরোহিত হয়েছিলেন, নাম তাঁর ফাদার মানুয়েল গ্রাসিয়া। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বাংলাদেশী বা বাঙ্গালী পুরোহিত। ব্যান্ডেল যুদ্ধ ও ধ্বংসের পর শত শত খ্রিষ্টভক্তদের সাথে তাঁকেও বন্দী করে আগ্রা নিয়ে যাওয়া হয়। অকথ্য নির্যাতনের পর ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তিনি শহীদ হন এবং আগ্রাতে তাকে সমাহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীপুরের খ্রিস্টান জনপদের ইতিহাস আরও পুরাতন। রালফ্ ফিট্চ শ্রীপুর বন্দর থেকে আলবার্ট কারভালহোস-এর জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে পেগু যাত্রা করেছিলেন। মিশনারী ফ্রান্সিস ফারনানদেস ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপুরে ছিলেন। এসময় দোমিঙ্গো দা কারভালহো শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের নৌ-বাহিনীর সি-এন-সি ছিলেন। তথ্য আছে, ফ্রান্সিস ফারনানদেস ও তাঁর সহচরগণ ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীপুর পৌঁছলে সেখানকার সরকার মিশনারী (প্রচার) কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অনুমতি দেন এবং ছয়শতটি স্বর্ণ খণ্ড, টাকা ও গীর্জা নির্মাণের জন্য জায়গা/স্থান বরাদ্দ করেন। (জুলিয়ান সুনীল মর্টিন রয়, ২০০৪)। শ্রীপুর ও লরিকুল (নরিকুল) সংক্রান্ত লেখা চিঠি পত্রে এমনও তথ্য পাওয়া যায় যে, এখান থেকে বাঙালী ছাত্রদের পড়ালেখার জন্য গোয়ার "সান পাওলো স্কুলে" পাঠানো হতো। ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে যে পাঁচজন ছাত্রকে গোয়া পাঠানো হয়েছিল তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীপুরই ছিল ঢাকা অঞ্চলের খ্রিস্টানদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ শ্রীপুর থেকে ক্রমান্বয়ে ঢাকা, লরিকুল ও কাত্রাবু প্রভৃতি স্থানে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন এবং এই সমস্ত স্থানে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগীজগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ঢাকায় নারায়নদিয়া ও পুলবেরিয়া (ফুলবাড়িয়া) বসতি স্থাপন করতে থাকেন। পর্তুগীজদের বসতি স্থাপনের পরেই আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় গমন করেন এবং ঢাকার নারাযনদিয়ায় (নারিন্দা) একটি গীর্জা নির্মাণ করেন।

লরিকুলঃ মেজর জেমস রেনেল (১৭৪২-১৮৩০) এর মানচিত্র থেকে নেয়া তৎকালীন (১৭৬৭ খ্রিঃ) সমগ্র পূর্ববঙ্গের একটি ম্যাপে গুরুত্বপুর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করা আছে। সেখানে ঢাকা শহর, শ্রীপুর, লরিকুল, কাত্রাবো, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ভূষণা ও অন্যান্য স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ঐ মানচিত্র অনুযায়ী শ্রীপুর থেকে লরিকুল ছিল দক্ষিণ পুর্বদিকে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। ঢাকা থেকে ২৮ মাইল সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান করছিল এবং চাঁদপুর ছিল লরিকুলের উত্তরে। বিভিন্ন ইতিহাসবেত্তাদের তথ্য অনুযায়ী লরিকুলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্তুগীজ ও নেটিভ খ্রিস্টবিশ্বাসীর বসবাস ছিল। নৌ-বন্দর ও লবণের কারখানা/ব্যবসা ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানটির গুরুত্ব বিবেচনায় আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ সেখানে একটি পাকা গীর্জা নির্মাণ করেন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বা তারও আগে। যদি তা-ই হয় তবে বঙ্গভুমিতে প্রথম গীর্জা স্থাপিত হয়েছিল লরিকুলে। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপুর সম্পুর্ণরূপে পর্তুগীজদের অধীনে ছিল। আগষ্টিনিয়ান ইতিহাসবিদ সিকারডো ১৬৮২ খ্রিঃ লরিকুলে একটি গীর্জার অস্তিত্ব দেখেছেন। রেনেল ১৭৬৫ সনে লিখেছেন সেখানে তিনি গীর্জার ধ্বংসাবশেষ ও ইট নির্মিত অনেক বাড়ীঘর দেখেছেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের Analecta Augustiniana অনুয়ায়ী লরিকুলে খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ছিল ২০০০ জন। ছয় সাত শত বছর আগের বিবেচনায় এটি ছিল বিশাল খ্রিস্টীয় জনপদ। লরিকুল ছিল শিল্প ও বাণিজ্য বন্দর। পর্তুগীজ ও দেশীয় খ্রিস্টান মিশ্রিত, ফলে সেখানে স্থানীয় ভাষার পাশাপশি পর্তুগীজ ভাষাও প্রচলিত ছিল।

আঠারগ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে মুখে শুনেছি, অরিকুল, নরিকুল ও মেঘুলা মলিকান্দার কথা। তবে শ্রীপুরের কথা কখনো বলতে শুনি নাই। তারা প্রায়শ:ই বলতেন, আমরা মেঘুলা মালিকান্দা থেকে এসেছি। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এবং বিগত দুই তিন শ' বছরের কীর্তিনাশা পদ্মা নদীর গতিপথ বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই উঠে আসবে যে, প্রথমে শ্রীপুর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, এরপর পদ্মা নদী লরিকুল গ্রাস করে। আমাদের চার্চের রীতি অনুয়ায়ী তথ্য থাকা উচিত ছিল, সেখানকার স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ কোথায় স্থানান্তরিত বা অভিবাসন করেছিল। ধরে নেয়া যায় যে, পর্তুগীজ ও তাদের কর্মচারীদের অনেকেই হয়তো পর্তুগীজদের সাথে তাদের দেশে বা অন্যত্র চলে গেছে। আর বাকীরা অদূরবর্তী পদ্মার নদীর উজান তীরবর্তী নারিশা, মেঘুলা, মালিকান্দায় বসতি স্থাপন করেছিল। কোন কোন পরিবার ভুলুয়া (নোয়াখালীর পশ্চিমে), সাহেবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ..... বসতি গড়ে থাকতে পারে।

চন্ডিপুরঃ জেরম ডি' কস্তা ও জুলিয়ান এ গোমেজ উভয়ে চন্ডিপুর নামক একটি খ্রিস্টীয় জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন। যেখানে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের Analecta Augustiniana অনুয়ায়ী খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ২০০০ জন। কিন্তু এই চন্ডিপুরের অবস্থান কোথাও সঠিকভাবে নির্দেশিত হয় নি। "তিনশ বছর আগে" পুস্তকে একটি মানচিত্র আছে, যেখানে দেখা যায় চন্ডিপুরের (চন্ডিখান) অবস্থান শ্রীপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। আমি চন্ডিপুরের অবস্থান খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চন্ডিপুর গ্রামটি পদ্মা নদীর পশ্চিম পাড় ঘেষে লরিকুলের কাছাকাছি ছিল। বর্তমানে চন্ডিপুর নামে একটি গ্রাম আছে। যেটি শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার অন্তর্গত। সেখানে আছে চন্ডিপুর বাজার ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই চন্ডিপুর গ্রামটি পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন প্রায়। সেখানে এখন কোন খ্রিস্টান আছে বলে আমার জানা নেই। ***চলবে...***

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে শতবর্ষী উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদ

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

উত্তরবঙ্গ! নামটি শুনলেই আচমকা চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব এক লীলাভূমি। হ্যাঁ, উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি সত্যিই অপরূপ! এখানকার ছায়া-সুনীবিড় বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক প্রান্তর স্নিগ্ধ-মায়াময়। বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতুতেই উত্তরবঙ্গে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন। অর্থাৎ যে ঋতু যেমন ঠিক তেমনই স্পষ্ট অবলোকন করা যায় উত্তরবঙ্গে। রূপ লাবণ্যের মোহনায় ভরপুর উত্তরবঙ্গ প্রকৃতিগত ভাবেই বিল-প্রধান এলাকা। এখানে রয়েছে মাঠের পর মাঠ, বিলের পর বিল বিস্তীর্ণ শ্যামল সমভূমি। হয়তো এই জন্যই ঋতুবৈচিত্র্যের পালাবদল এখানে এতোটা মোহনীয়। দিগন্তজোড়া ফসলি মাঠে দেখা মেলে সবুজের হাতছানি। গ্রীষ্মের দাবধাহে ধু-ধু মরিচিকা, বর্ষায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপী বিল ও মাঠগুলোর উদাত্ত আহ্বান, শরতের শিউলীর গান, হেমন্তে নতুন ধানের মৌ-মৌ গন্ধ, শীতের আবছায়া ও খেজুরের রস এবং বসন্তের সজীবতা উত্তরবঙ্গের নিত্য সঙ্গী। এমনতর প্রেম, মোহ আর প্রাণবন্ততার সাথে সখ্যতা গড়তে গড়তে এরই মাঝে উত্তরবঙ্গের তথা রাজশাহীর ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদ আজ শতবর্ষী। এ যেন শতবর্ষী মহিরুহ! আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই এর পেছনের কিছু ইতিহাস, কিছু ঐতিহ্য, কিছু সংস্কৃতি।

সেই একশত বছর আগের কথা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ! বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহীতে আজ হতে একশত বছর পূর্বে ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদের বসতি গড়ে উঠেছিল বড়াল নদের তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায়। সেই সোনালী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে জীবন ও জীবিকার তাগিদে এবং ভাগ্যান্বষণে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গাজীপুরের ভাওয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লীগুলো হতে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ পাড়ি জমিয়েছিল আজকের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার পাবনা ও নাটোর জেলার বিভিন্ন এলাকায়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, দড়িপাড়া, মঠবাড়ী, মাউসাইদ, পাগাড়, ভাদুন এবং ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী নিয়েই আজকের ভাওয়াল অঞ্চল। এই ভাওয়াল অঞ্চলই উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টানদের আদি বাসভূমি। গাজীপুরের ভাওয়াল অঞ্চলে সর্বপ্রথম খ্রিস্টবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছিল প্রায় চারশত বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে। জানা যায়, সেই সময়ে আরকান রাজ্যের মগ জলদস্যুরা ফরিদপুর জেলার ভূষণা রাজ্য আক্রমণ করেছিল। মগ জলদস্যুরা ফিরে যাওয়ার সময় ভূষণার ২২ বছর বয়সী হিন্দু রাজপুত্রকে অপহরণ করে আরকান রাজ্যে নিয়ে যায়। অপহৃত রাজপুত্রের জীবন বাঁচানোর জন্য পর্তুগীজ ফাদার মানুয়েল দ্য রোজারিও প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মগদের নিকট থেকে রাজপুত্রকে ক্রয় করে আনেন। পরে এই রাজপুত্র ফাদারের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে একপর্যায়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে 'দোম আন্তইন দ্য রোজারিও' নাম ধারণ করেন এবং খ্রিস্টের প্রেম ও মঙ্গলবাণী প্রচারে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে, তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীকে স্বপ্নে দেখে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হন। তাই তিনি খ্রিস্টান হওয়ার পর 'আন্তইন' নামটি ধারণ করেন। আর পর্তুগীজ শব্দ 'দোম' অর্থ হল 'রাজপুত্র'।

তিনি নিজের এলাকা ফরিদপুরের ভূষণা ছাড়াও সমগ্র ভাওয়াল এলাকায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মাঝে বাণীপ্রচার করতে থাকেন। সাধরণত ধর্মীয় গান, কথোপকথন ও সাধু-সাধ্বীদের জীবনীভিত্তিক পালাগানের মাধ্যমেই তিনি বাণীপ্রচার করতেন। তাঁর রচিত সাধু আন্তনীর পালাগান (ঠাকুরের গীত) আজও প্রচলিত আছে। তিনি তাঁর গান ও পালাগানে দেখাতেন এক নতুন খ্রিস্টীয় সমাজের পরিপূর্ণ ও জোরালো জীবনচিত্র। কোন কোন গানে ফুটে উঠতো সাধারণ মানুষের চিরাচরিত জীবনবোধ, বিশ্বাস ও যাপিত জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান। ভাবপ্রবণ মানুষ এখানে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে গীতিপ্রাণ বাঙালির মানসে দোম আন্তইন দ্য রোজারিও যে জোয়ার এনেছিলেন, তাতে সেই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। একপর্যায়ে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে দোম আন্তইন আগস্টিনিয়ান যাজক সংঘে প্রবেশ করেন এবং আমৃত্যু তিনি এই সংঘে থেকেই বাণী প্রচারের কাজ করেছেন। তৎকালীন সময়ে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে নবদীক্ষিত খ্রিস্টবিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফাদার লুই দস্ আঞ্জুস নাগরী গ্রামটি ক্রয় করে সেখানে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। সমগ্র ভাওয়াল অঞ্চলের মধ্যে এই নাগরীতেই সর্বপ্রথম খ্রিস্টবাণীর বীজ বপণ করা হয়েছিল। আর নাগরী মিশন থেকেই ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টানদের যাত্রা শুরু।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুযায়ী, নবাব আমলে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বশেষ নবাব ছিলেন নবাব সিরাজদৌল্লা। তিনি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের প্ররোচনায় পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজরা দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর এই উপমহাদেশ শাসন করেন। এই ইংরেজ শাসনেরই শেষার্ধে গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে খ্রিস্টভক্তগণ উত্তরবঙ্গের পাবনা ও নাটোর জেলায় আগমন করেন। তৎকালীন সময়ে অভাব-অনটন, জমি-জমার সংকট এবং নানাবিধ সমস্যা মাথায় নিয়ে তারা উত্তরবঙ্গে পাড়ি জমিয়েছিল। তখন তাদের না ছিল কোন নিরাপত্তা, না ছিল মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই। তবে তাদের চোখে মুখে ছিল স্বপ্ন ও একটি নতুন জীবনের ঠিকানা। হয়তো এই জন্যই তারা আপন ঠিকানা আপন অঞ্চলকে বিদায় জানিয়ে এসে পৌঁছেছিল রাজশাহীর পাবনা ও নাটোর জেলার বড়াল নদের পাড়ে। তখন সড়ক পথের চেয়ে নদীপথ ছিল সহজলভ্য। তাই উত্তরবঙ্গের পূর্বপুরুষগণ গাজীপুরের শীতলক্ষ্যা হয়ে উত্তাল যমুনা পেরিয়ে এসে থেমেছিল চলনবিল অধ্যুষিত বড়াল নদের পাড়ে।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদের পূর্বপুরুষ ছিলেন পলু শিকারী (পল গমেজ)। যিনি প্রধানত শিকারের উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের ভাওয়াল এলাকার নাগরী মিশনের বাগদী গ্রাম থেকে পাবনা জেলার মথুরাপুর গ্রামে আসেন। কথিত আছে, তিনি শুকর শিকারের জন্য পাবনা জেলার চাটমোহর থানার মথুরাপুর এসেছিলেন নিকটবর্তী উথুলী গ্রামের এক ব্যাপ্টিষ্ট পালকের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। তখন ছিল জমিদারী প্রথা। সেই সময়ের হিন্দু জমিদার বাবু আদেশ জারি করেছিলেন কেউ যদি শুকর মেরে সেই শুকরের লেজ তাঁকে দেখাতে পারে, তবে সেই শিকারীকে জমি পত্তন দেওয়া হবে। কেননা শুকরের পাল তখন ফসলি জমি, বিশেষ করে ধানের ক্ষেত নষ্ট করে ফেলত। পলু শিকারী জমিদার বাবুকে শুকরের লেজ দেখিয়ে মথুরাপুরের লাউতিয়া গ্রামে জমি পেয়েছিলেন। পরে সেখানেই তিনি সপরিবারে বসতি গড়ে তোলেন। এই পলু শিকারীর হাত

ধরেই উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ রাজশাহীর মথুরাপুরে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মথুরাপুরের নিকটবর্তী ফৈলজানা, বোর্ণী, বনপাড়া, ভবানীপুর গ্রামে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যতদূর জানা যায়, মথুরাপুরের নিকটবর্তী ফৈলজানা গ্রামে প্রথম আগমন করেন রাঙ্গামাটিয়া মিশনের বিছু কস্তার পুত্র পলু কস্তা (পল কস্তা) ও তাঁর পরিবার। অভিবাসী খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মথুরাপুর মিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বলা বাহুল্য, এই মথুরাপুর মিশন থেকেই উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদের যাত্রা শুরু।

ছেলেবেলায় গল্পে গল্পে শুনেছি, শুরুর দিকে পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা এতোটা সহজ ছিল না। এলাকার পর এলাকা ছিল গহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাই মানুষের সংখ্যাও খুব কম ছিল। চারপাশ ছিল বাঘ, বন্যশূকর ও বিষধর সাপে পরিপূর্ণ। বাঘের ভয়ে রাতে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত। পুরুষেরা দিনে ও রাতে দল বেঁধে বাড়ি ও গ্রাম পাহারা দিত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই হিংস্র বাঘের দল বাড়ির উঠান কিংবা গোয়াল ঘর থেকে গরু-ছাগল টেনে-হিঁছড়ে জঙ্গলে নিয়ে যেত। বাঘের এই হিংস্রতার কারণে প্রায় প্রতি এলাকাতেই একজন করে শিকারী থাকত। সেই শিকারীর দলে থাকত অন্যান্য পুরুষগণ। সেই হিসেবে পলু শিকারী ছিলেন মথুরাপুরের প্রধান শিকারী। এদিকে ফৈলজানা গ্রামের প্রধান শিকারী ছিলেন আলেফ্রেড শিকারী (আলফ্রেড গমেজ)। ১৯৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ফৈলজানার কদমতলী গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন গাজীপুরের তুমিলিয়া মিশনের বাঙ্গালহাওলা গ্রাম হতে আগত "মুলাগ্ বাড়ির" পরিবার। এই পরিবারের আমু শিকারীর একমাত্র ছেলে আলফ্রেড গমেজ এলাকায় "শিকারী" নামেই বহুল পরিচিত। ফৈলজানা মিশনের জনশ্রুতি হতে জানা যায়, ফৈলজানা এলাকার খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে একমাত্র আলফ্রেড গমেজ-ই বন্দুকধারী শিকারী ছিলেন। অন্যেরা তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করতেন। তিনি বাঘ ও বুনো শুকর শিকারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কথিত আছে, তিনি বেশ কয়েকটি বাঘ মেরেছিলেন। আলফ্রেড শিকারীর ফুটবল খেলা সম্বন্ধেও এলাকায় বেশ জনশ্রুতি রয়েছে।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি গ্রাম গহীন বন জঙ্গলে ঘেরা ছিল বলে দিনের বেলাতেও রীতিমত আধো আলো আধো ছায়া বিরাজ করত। রাতে বাঘ ও সাপের ভয়ে ঘরের বাইরে কেউ একা বের হতো না। বাইরে যেতে হলে একত্রে কয়েকজন বের হত। এই সকল প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেই সেখানে পূর্বপুরুষ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের টিকে থাকতে হয়েছে। তাদের জন্য কোন কিছুই প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রকৃতির সাথে তাদের অনবরত করতে হয়েছে সংগ্রাম। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। তখন পাবনা ও নাটোর ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ হিন্দুদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তাদের কাছ থেকেই জমি চেয়ে নিয়ে কিংবা ক্রয় করে বসতি গড়ে তুলতে থাকে। তারা দিনের বেলায় দল বেঁধে অল্প অল্প করে জঙ্গল পরিষ্কার করে কুঁড়ে ঘর তৈরি করত। এভাবেই কালের পরিক্রমায় উত্তরবঙ্গের পাবনায় গড়ে উঠে খ্রিস্টীয় সমাজ, খ্রিস্টীয় জনপদ। নাটোর জেলার মধ্যে বনপাড়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে, যদিও বনপাড়ার বিভিন্ন গ্রামে (গোপালপুর ও ভবানীপুরসহ) খ্রিস্টানগণ আগমন করেছিল মথুরাপুর ও ফৈলজানার সমসাময়িক সময়েই। বোর্ণী মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। সব মিলিয়ে আজ উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার ফৈলজানা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, বোর্ণী মারীয়াবাদ ধর্মপল্লী, বনপাড়া লুর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, গোপালপুর স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার ধর্মপল্লী ও ভবানীপুর সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লীগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। বলা বাহুল্য, আজ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের চালিকাশক্তি এই ধর্মপল্লী ছয়টিতে রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার খ্রিস্টভক্ত। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ যেন আরেক ভাওয়াল!

এ থেকেই অনুধাবন করা যায় উত্তরবঙ্গে অভিবাসী হিসেবে আসা এই খ্রিস্টীয় জনপদটি ছিল উন্নত চিন্তা চেতনার মানুষ। তারা ছিল সংস্কৃতিমনা ও ভাবাবেগে পরিপূর্ণ মানুষ। তারা নিজেদের জন্মস্থান ও বসতবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে তারা এক পা-ও সরে দাঁড়ায়নি। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় দলবেঁধে রোজারি মালা প্রার্থনা করত। বড়দিনের আগে বাড়ি বাড়ি কীর্তন করা হত। প্রায়শ্চিত্তকালের পুরো সময় বাড়িতে বাড়িতে চলত যিশুর যাতনাভোগের পালাগান। আর তাছাড়া সারা বছরই চলত সাধ্বী আগ্নেশের পালাগান, সাধ্বী ফিলোমিনার পালাগান, সাধু আন্তনীর পালাগান (ঠাকুরের গীত), বৈঠকী গান এবং যিশু লীলা ইত্যাদি। শুরু হতে আজোবধি তাদের মধ্যে রয়েছে নিষ্কলুষ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। যার মধ্য দিয়ে তারা সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি দূর করত আর ভুলে যেত সকল কষ্ট ও বেদনা। সেই সময়ে তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল বিভিন্ন গান, নাটক, যাত্রা ও পালাগান। আজও আদি ভাওয়াল ও উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টান জনপদের মধ্যে আচার-আচরণ, অভ্যাস-ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। স্থানীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেও ইতিহাসের ধারাপাতে শতবর্ষ ধরে তারা লালন করে চলেছে তাদের আদি বৈশিষ্ট্য, আদি স্বভাব। আজও উত্তরবঙ্গের বয়োজেষ্ঠ্যরা ঢাকা কিংবা গাজীপুরের ভাওয়ালে যাওয়ার সময় বলেন, "দেশে যাচ্ছি"। এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তারা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হলেও তাদের মনেপ্রাণে "দেশ" যেন আজো সেই গাজীপুরের ভাওয়াল।

আদি প্রথানুযায়ী, আজও বড়দিনের পূর্বের দিনকে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলারা বলে থাকেন 'কচুদার'। এদিন সকাল থেকেই বাড়িতে বাড়িতে বড়দিনের ধুমধাম আরম্ভ হয়ে যায়। বাড়ির গৃহিণীরা সকাল হতে না হতেই নিজ নিজ বাড়ির উঠানে শেষ লেপন দেয়। বাড়িতে বাড়িতে পুরুষেরা শূকর কাটায় মেতে উঠেন। দুপুরের পর থেকে মাঝ রাত অবধি বাড়ির গৃহিণীরা নানান পদের পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যাবেলা গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে এবাড়ি-ওবাড়ি গিয়ে বড়দের নিকট থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। বড়দিন বা পুনরুত্থান উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রতিটি বাড়িতে বা কোন একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে সামাজিক যে সভা বসে তাকে 'বৈডক' বা 'বোডুক' বলা হয়। সেখানে বিভিন্ন পদের পিঠা পরিবেশন করা হয়। এছাড়া সামাজিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে জরুরি কোন সভা অনুষ্ঠিত হলে তাকে বলা হয় 'গুয়ামেল'। গুয়ামেল সাধারণত সন্ধ্যা বা রাতে হয়ে থাকে। গুয়ামেল শেষে উপস্থিত সকলকে গুড়-মুড়ি দেওয়া হত।

বিবাহের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের খ্রিস্টান জনপদ তাদের আদি রীতি-নীতিই অনুসরণ করে থাকেন। সাধারণত ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত হলে তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্তা চূড়ান্ত হলে, সমাজের সামনে ছেলে মেয়ের মত নেওয়া হয়। একে 'জবদান' বা 'বাগদান' বলে। এর মধ্য দিয়ে বিয়ের সামাজিকতা শুরু এবং বিয়ে স্থির হয়। সাধারণত বিয়ের আগে মেয়ের বাড়িতে 'পান-মাছ' অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সব খরচ ছেলেপক্ষ বহন করে। এ অনুষ্ঠানে মাছ ও পান অত্যাবশ্যক। তাছাড়া দুধ ও মিষ্টি নিয়ে আসার প্রচলনও অনেক পুরোনো। পান-মাছের দিনই সাধারণত মেয়েপক্ষের মিশনে নাম লেখানো হয়। অতিথিদের নিমন্ত্রণ দেয়ার ক্ষেত্রেও কিছু রীতি-নীতি অনুসরণ করে থাকে। যেমন, কোন বাড়িতে দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ দিতে গিয়ে যদি বাড়িতে কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে ঘরের পিঁড়ার কোণা ভেঙ্গে রেখে আসার রেওয়াজ আছে। মেয়ের বাড়ি

যদি ছেলের বাড়ি থেকে অনেক দূরে হয়; তবে আগের দিন বা সুবিধামত সময়ে মেয়ে তুলে আনা হয়।

বিবাহের পূর্বদিনকে 'কামানী-গাদ্দানী' বলে। এদিন ছেলে ও মেয়েকে গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। গায়ে হলুদ মাখনো শেষ হলে বর-কনেকে গোসল করানো হয়। বিয়ের দিন কনে ও বর একজন আয়র (সাহায্যকারী) সহ গির্জায় আসে। বর-কনের আয়রকে অবশ্যই বিবাহিত পুরুষ ও নারী হতে হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের ধর্মীয় রীতি শেষে পুত্র ও নববধূকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বরের মা উঠান থেকে ঘরের ভেতর বা দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত নিজের একটি শাড়ি বিছিয়ে অপেক্ষায় থাকে এবং বর-কনে এসে মায়ের সেই শাড়ি মাড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বরের বাড়িতে দুপুরের আহারের পূর্বে নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করে যে উপহার দেওয়া হয় তা 'ব্যাবার' নামে পরিচিত। প্রীতিভোজ দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিয়ের পরে মেয়ের বাড়ীতে যে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান হয় তাকে 'ফিরাণী' বা 'চাঁদরী' (বৌভাত) বলা হয়। ফিরানীর পূর্বে কখনো 'নাইয়র' দেওয়া হয় না। ফিরানীর পর নববধু নয়দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যায়, যা 'নাইয়র' নামে পরিচিত। 'নাইয়র' থেকে ঘটা করে ফিরে আসার সময় নববধূ শ্বশুরবাড়ির জন্য সঙ্গে করে দুধ, মিষ্টি ও নানা ফলমূল নিয়ে আসে; একে বলা হয় 'ডালা'।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াল সংস্কৃতিতে মৃত্যুকালীন সময়েও নানা আদি আচার-বিধি পরিলক্ষিত হয়। কেউ মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ ঘরের বারান্দায় রাখা হয়, মাথার কাছে পবিত্র ক্রুশ, প্রদীপ্ত হারিকেন, আগরবাতি ও ধূপ জ্বালানো হয়। তাছাড়া মহিলারা দলবেধে মৃতের আত্মার কল্যাণে একনাগারে রোজারিমালা প্রার্থনা করতে থাকেন। মৃতদেহ সমাহিত করার আগে শেষ বারের মত স্নান করানো হয়। স্নান শেষে মৃতদেহকে নতুন সাদা কাপড়ে সজ্জিত করে বাক্স বা কফিনে রাখা হয়। মৃতদেহ বাড়ি থেকে কবরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার সময় কেউ একজন শবযাত্রার পিছনে পিছনে জল ঢালতে ঢালতে আসে এবং যেখানে জল শেষ হয়, সেখানেই জলের পাত্রটা উল্টো করে রাখা হয়। এর অর্থ চির বিদায়। এরপর গির্জার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কফিনসহ সমাহিত করা হয়। মৃতকে সমাধিস্থ করার দিন সন্ধ্যায় মৃতের বাড়িতে গ্রামবাসী একত্র হয়ে প্রার্থনা করেন এবং তিন দিন পর পরিবারের লোকজন 'নিরামিষ ভাঙে' অর্থাৎ 'মাছ-ভাত' খায়। এই তিন দিন মৃত ব্যক্তির ঘরে একটি বাটিতে কিছু চাউল ও এক গ্লাস জল রাখা হয়। মারা যাওয়ার ৪০ দিন পর মৃতের আত্মার কল্যাণে 'চল্লিশা' পালন করা হয়। এখানে সমাজের বা গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। তাছাড়া পরবর্তীতে যে কোন সময় শ্রাদ্ধ করারও রীতি আছে। এ সকল অনুষ্ঠানে খ্রিস্টযাগের প্রথা আছে।

এতোসব ধর্মীয় ও সামাজিক কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রমী লৌকিক বিশ্বাসের অনুশীলন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াল জনপদে আজও যেন অবশ্য পালনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পর ঘর ঝাড়ু দিলে ঘর থেকে লক্ষ্মী চলে যায়। সন্ধ্যার পর গর্ভবতী মহিলারা বাড়ির বাইরে গেলে ভূতে ধরে। রাতে ভাজা মাছ খেয়ে যে কেউ বাড়ির বাইরে গেলে ভূতে ধরে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার দিন ডিম খেয়ে গেলে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভ্রমণে যাওয়ার প্রারম্ভে শূন্য কলসী বা পাকা কলা দেখলে সে ভ্রমণ শুভ হয় না। আবার জোড় কলা বা সুপারি অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের খেতে দেওয়া হয় না, তাতে জোড়া সন্তান হবার সম্ভাবনা থাকে। মাটির সরা বা ঢাকনীর উপর খাবার রেখে খেলে দাড়ি-গোফ হয় না। সন্ধ্যাবেলা এলোচুলে থাকলে বিশেষ করে নব বধূর উপর জিনের নজর পরে বা আজরে ধরে। তুফানের হাত থেকে রক্ষার জন্য তালপত্র রবিবারের আশীর্বাদিত খেজুর পাতা উঠানে ফেলে দিরে তুফান থেমে যায়। কুটুম পাখি ডাকলে অতিথি আসে। সকালে কাক ডাকলে খারাপ খবর আসে। হাত থেতে কিছু পরে গেলে বা জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ স্মরণ করে। এঁটো পানি সন্ধ্যাবেলা বাইরে ফেললে পেত্নী ধরে ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ আদিতে যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবরণে বেড়ে উঠেছিল, সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই যুগ যুগ ধরে তাদের সারা জীবনের ভিত্তি হয়ে আছে। ১৯২০-২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এই শত উর্ধ্ব বর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি তাদের সামগ্রিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করছে। আদি ভাওয়ালে অবস্থানকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের পূর্বপুরুষগণ সকলেই ভাওয়াল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বেড়ে উঠেছিল ব'লে আজও এর ধারক ও বাহকেরা আদি ভাওয়ালে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করে ও ভালবাসে। কেননা এটিই যে তাদের জীবন, জীবন সাধনা ও অস্তিত্বের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শতবর্ষ ধরে। শুভ হোক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে শতবর্ষী উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইলা খ্রিস্টানদের আগামীদিনের পথচলা...।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা, রাজশাহী।
২. ফাদার সুনীল রোজারিও, রাজশাহী।
৩. ফাদার সাগর কোড়াইয়া, রাজশাহী।
৪. ফাদার দিলীপ এস কস্তা, রাজশাহী।
৫. ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ঢাকা।

৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

সমবায় আন্দোলনে: সমবায়ের অগ্রগতিতে খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা দেশের একটি বৃহৎ সমবায় সমিতি হিসেবে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। এই সমিতির উদ্যোগে এবং এর শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাল্‌ব বর্তমানে বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহে: বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহেও বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন দেশে প্রেরণ করছেন প্রতিবৎসর, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ক্রীড়া জগতে: ক্রীড়া জগতে জাতীয় পর্যায়ে যে সকল খ্রিস্টান খেলোয়ার বা ক্রীড়াবিদ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে- প্রয়াত চিল্কা মং চৌধুরী মারী, প্রয়াত লিও ছেড়াও, প্রয়াত ইউজিন গমেজ, প্রয়াত দেবীনাশ সাংমা, প্রয়াত রেমন্ড হালদার, প্রয়াত ডলি ক্রুশ, মিউরিয়েল গমেজ-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র:

১) বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী, যেরোম ডি' কস্তা
২) বাংলার চার্চের ইতিহাস- ডেনিস দীলিপ দত্ত
৩) পল্লিউম স্মরণিকা, ২০১৭
৪) হাজার বছরের চট্টগ্রাম, দৈনিক আজাদী
৫) বাংলাদেশ আদমশুমারি-২০০১
৬) ওয়ার্ল্ড খ্রিষ্টিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়া
৭) দি কাথলিক ডিরেক্টরী অব বাংলাদেশ, ২০১৭

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহীর নবাই বটতলায় মা মারীয়ার সহায়তা

মিথুশিলাক মুরমু

প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জানুয়ারি উদ্‌যাপিত হলো মা মারীয়ার পর্ব। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন নবাই বটতলাতে আয়োজন করা হয় মা মারীয়ার পর্ব। মা মারীয়ার আশীর্বাদ ও তত্ত্বাবধানে এ গ্রামের খ্রিস্টবিশ্বাসীসহ এলাকার অগণিত লোক পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচেছিলেন। এ যাত্রায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রতিবেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৬ জন এবং একজন সাঁওতাল ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যার শিকার হয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণের উচ্চারণ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-এর ঢেউ পদ্মা-মেঘনা-যমুনাতে ঢেউ তুলেছিলো। রাজশাহীর পদ্মার ঢেউ আদিবাসীদেরকেও আচ্ছন্ন করে তুলেছিলো। ২৫ মার্চ থেকেই পাকিস্তানী হায়েনারা স্বাধীনতাকামী মানুষগুলোকে চিহ্নিত করতে শুরু করে; আর এই জঘন্য কাজে সহায়তা করেছিলো পাকিস্তান প্রেমী স্থানীয় রাজাকাররা। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়েছিলো আদিবাসী সাঁওতাল, উরাঁও, মাহালী, মুণ্ডা, কোলরা; বাঙালী স্বাধীনতাকামী যুবদের সাথে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে। ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধের কোনো এক সময় অত্র এলাকার আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিলেন রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কিংবা রহনপুর রেলওয়ে যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করলে পাকিস্তানীরা সহজে যাতায়াত করতে পারবে না। নিরীহ মানুষজনকে পাখির মতো ব্রাশফায়ার করে মারা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং রাজাকারদের উস্কন যে কোনো মানুষের চেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কাদা কাচা মাটির রাস্তা তাদের জন্য ছিলো হুমকিস্বরূপ। সত্যি সত্যিই একদিন সিতলাই রেলষ্টেশনের পার্শ্ব দিয়ে বেয়ে যাওয়া জামদোহা নদীর ওপর রেলসেতুটিকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপারেশন শুরু করে। সময়টি বর্ষাকাল, অনুমান করা যায় আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বরের দিকে। এই দলে অধিকাংশ যোদ্ধাই ছিলেন আদিবাসীরা। মাঠ জুড়ে ছিলো সবুজ ধানের সমাহার। রাতব্যাপী চেষ্টার পরও সফল হতে পারেনি, তাই সকাল হতেই এলাকা ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধার দলটি অন্যত্রে আত্মগোপন করে। বিষয়টি রাও হয়ে উঠলে রাজাকার ও পাকিস্তানী দোসররা বটতলাসহ আশপাশের আদিবাসীদের শায়েস্তা করার নীলনক্সা প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টিই এই এলাকার আদিবাসীরা সীমান্ত অতিক্রান্ত করে নি। গ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে– নবাই বটতলা, গণকাডাং, ডহরলাঙ্গি, বাড়িটোলা, নিমঘুটু, বর্ষপাড়া ইত্যাদি। মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যেই রয়েছে পদ্মা নদী, নদী ওপারই হচ্ছে ভারতের লালগোলা-মুর্শিদাবাদ জেলা। অতঃপরও নাড়িপোতা পিতৃপুরুষদের ভিটামাটিকে ছেড়ে যেতে চাননি। শুধুমাত্র মাটি ও দেশ, ভালোবাসা ও মমতা এবং ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়েই আঁকড়ে থেকেছেন।

নবাই বটতলা অত্র অঞ্চলের আদিবাসী, খ্রিষ্ট বিশ্বাসী আদিবাসী গ্রামগুলোর মধ্যে জনবহুল। হঠাৎ হঠাৎ জনরব উঠত পাকিস্তানীরা আসছে, দেরী না করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। যুদ্ধের ডামাডোলে গ্রামের বাসিন্দারাও মাঝে মাঝে অসহায় হয়ে পড়তেন; কখনো কখনো উত্তর-পশ্চিম দিকের কমলাপুর গ্রামের দিকে পালিয়ে আশ্রয় নিতেন। ঠিক আশ্বিন-কার্তিকের দিকে জানলেন, আদিবাসী আমতুলি পাড়া (কাশিঘুটু) থেকে পাক বাহিনী ১০/১২ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। এরপর সপ্তাহ খানেক পরে বাড়ীটলা (ঘোসপাড়া) থেকেও ১০/১২ জনকে ধরে নিয়ে যায়, তারা কেউ-ই ফিরে আসেনি। শ্রুতি রয়েছে– পদ্মার তীরেই তাদেরকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে পাকিস্তানীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে একদিন গ্রামের গির্জা পরিচালক মি. লক্ষণ ভিক্টর হাঁসদা ও লুইস সরেন'রা গ্রামের খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের উজ্জীবিত করলেন, আর না দৌড়াদৌড়ি; যদি মৃত্যু হয় হোক, আমরা আর পালিয়ে বাঁচবো না। তারা বললেন, আমরা না খ্রিস্টের অনুসারী, খ্রিস্ট আমাদের পিতা! যিশু খ্রিস্টের মা আমাদের মা মারীয়া। আমরা তাঁর কাছেই নিজেদেরকে সমর্পণ করি; আসুন প্রতিদিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। শুরু হলো নিবেদিতভাবে মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা, রোজারিমালা প্রার্থনা। তারা মানত করে উচ্চারণ করলেন, 'মা যদি এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, তাহলে আমরা প্রত্যেক বছর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমার কাছে ধন্যবাদের পর্ব হিসাবে পালন করবো।' সেদিন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, সত্যি সত্যিই যদি হিংস্র পাকবাহিনীর আগমন ঘটে, আর আমরা যদি পূর্বাহ্নে টের পাই; তাহলে দেরী না করে যে কেউ-ই গির্জার ঘণ্টা বাজাবে এবং একযোগে গ্রামবাসী গির্জায় আশ্রয় নেবেন। মৃত্যুকে যদি আলিঙ্গন করতেই হয়, তাহলে একসাথে সবাই করবো; আর যদি বাঁচি সবাই-ই বাঁচবো। আমাদের মৃত্যু হবে গির্জা ঘরেই। পবিত্র বাইবেল থেকে নিজেদের বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করতেন। বিশেষ করে ইস্রায়েলীয়রা যখন ফরৌণের দাসত্ব থেকে মোশীর নেতৃত্বে মিসর ত্যাগ করছিলেন; সেই মুহূর্তের পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতেন বার বার। ইস্রায়েলদের পেছনে অস্ত্রধারী ফরৌণের সৈন্যসামন্ত আর সম্মুখভাগে লোহিত সাগরের অগাধ জলরাশি। একমাত্র ঈশ্বরই ভরসাস্থল, মৃত্যুর গহবর থেকে তিনি ব্যতীত কেউ-ই উদ্ধার করতে সক্ষম নন। আশ্চর্যজনকভাবেই ঈশ্বর সেদিন জলকে আদেশ করলেন, জল বিভক্ত হয়েছিলো; লক্ষ লক্ষ ইস্রায়েলীয়রা নিরাপদে অতিক্রম করেছিলেন কিন্তু শত্রুসেনারা সমূলে ধ্বংস হয়েছিলো। ঈশ্বর জলকে ব্যবহার করলেন, ডুবে মারা গেল ফরৌণের পদাতিক বাহিনী।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ পশ্চিম দিক থেকে পঙ্গপালের মতো মাঠ ভর্তি পাকিস্তানী খাকি পোষাকধারী সেনারা তরতর করে এগিয়ে আসছিলো। চোখের পলকে খবরটি পুরো গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে এলাকায় রটে যায়। গির্জার ঘণ্টা বাজানো হয়েছিলো, ঘণ্টার ধ্বনির আহ্বানে সাড়া দিল খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা, হিন্দু, মুসলমানরা; আদিবাসী নন খ্রিস্টিয়ানরাও। পুরো গির্জাঘর লোকে লোকারণ্য। গির্জার বেদীতে দন্ডায়মান 'মা মারীয়া'র মূর্তি। গির্জার দেয়ালে শোভা পাচ্ছিল ক্রুশ। এক মনে, এক প্রাণে গির্জায় পিন পতন নিরবতা; হাঁটু গেড়ে হাত দুটি জোড় করে সবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মা মারীয়ার দিকে। এক সময় মৃত্যুদূতের আগমন ঘটে, পাকিস্তানী সৈন্যরা রাইফেল কাঁধে নিয়ে গির্জাঘরে সহসা প্রবেশ করে। ইতোমধ্যেই গির্জাঘরের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলেছে অস্ত্রধারীরা। দু'একজন রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের আনাগোণা; এরা যুগে যুগে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। শতাধিক সৈন্যে বহর দলটি কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে– কেউ দক্ষিণ দিকে, কেউ গ্রামের প্রান্তে। এভাবেই পুরো এলাকাটিতে ত্রাহি ত্রাহিভাব। নবাই বটতলার গির্জাঘরের অভ্যন্তর থেকে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বের করা হলো, তাদের প্রতি মেজর সাহেবের সন্দেহের দৃষ্টি। মুক্তিবাহিনীর সদস্য মনে করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো, পার্শ্বে থাকা রাইফেল দেখিয়ে জানতে

চাইলেন, 'এটা কি? এটাকে কি বলে?' ফ্রান্সিস কিস্কু কয়েকজনের অন্যতম। সাঁওতাল যুবরা উত্তর দিয়েছিলো, 'সামনের দিকে লোহা আর পিছনের দিকে কাঠ, তবে এইটাকে কি বলে তারা জানে না।' সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, মেঘের ছায়ায় সূর্য মুখ লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টায় মত্ত। গির্জার খ্রিষ্টভক্তদের চোখের জলের প্রার্থনা আকাশ ভেদ করে পৌঁছেছিলো স্রষ্টার কাছে; কেননা মা মারীয়া তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। ওই সময় গ্রামের দক্ষিণ দিকে যাওয়া পাকিস্তানী হায়েনারা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে ৭/৮ জনকে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে। গির্জায় যাওয়ার আগেই পাকিস্তানীরা পৌঁছে গিয়েছিলো গ্রামে। যুবদের বেঁধে ফেলা হলো এবং বাড়ি থেকে সামান্য দূরে ব্রাশফায়ার করার লক্ষ্যে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। এই বুঝি হাতে থাকা মেশিনগান গর্জে উঠবে। গ্রামের এক প্রান্তে গির্জায় ঈশ্বরের বন্দনা, অন্যপ্রান্তে শয়তানরূপী পাকিস্তানীদের হত্যার তোড়জোড়। যারা প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রশংসায় সম্মিলিত হয়েছেন, মা মারীয়ার অনুগ্রহ যাঞ্চা করেছেন; মুখে স্বীকার ও হৃদয়ে বিশ্বাস করেছেন যিহোবা-ই বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের মালিক; ঠিকই তিনি উপযুক্ত সময়ে উত্তর দিলেন। সৈন্যবাহিনীর মেজর হুইসেল দিলেন, চেইন অফ কমাণ্ড। সেনাবাহিনীতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যাওয়ার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। হুইসেলের শব্দ শোনার সাথে সাথে সৈন্যরা দেরী না করেই ছুটলেন গির্জামুখী মেজরের দিকে। মৃত্যুর সারিতে দাঁড়ানো যুবরা নিজেদের বন্ধন খুলে আত্মগোপন করলেন। এবার মেজর সাহেব গ্রাম নিশ্চিহ্নের লক্ষ্যে অগ্নিসংযোগের হুকুম দিলেন। নতুন ঘোষণা পরিপূরণ করতে গিয়ে হত্যার প্রক্রিয়া ভাটা পড়ে যায়। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আগুন জ্বালানোর কাজে উৎসাহী হয়ে পড়লেন, সেখানেও ঘটল অত্যাশ্চর্য ঘটনা। গ্রামের সুন্দর মারাণ্ডী, চায়লা এবং ভুজু সরকারের গোয়াল ঘর ও পশ্চিম দিকের বিদু সরেনের বাড়ি সামান্য পুড়ল; এক সময় নিজ থেকেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পাটের আঁটি দিয়ে আগুন দিতে উদ্ধত হয়েছে শুকনো খড়ের ছাউনিতে তবুও আগুনের লেলিহান শিখা যেন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অদৃষ্টের আদেশে। শত্রুসেনারা প্রানান্তর প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে পর্যবসিত হয়েছে।

৭১'-এ কিশোরী কস্তান্তিনা হাঁসদা নিজেই সমস্ত ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী। জানাচ্ছিলেন, 'একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি মানুষের হৈ চৈ আর ছোটাছুটি। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা কি হয়েছে? বাবা আমাকে বললেন, দেশে যুদ্ধ চলছে, পাকিস্তানী সৈন্যরা বিলের মধ্যে এসে গেছে আমাদের মেরে ফেলার জন্য। আর ঐ মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে উঠল এবং আমি আমার অন্ধ দাদীকে নিয়ে সোজা গির্জা ঘরে চলে গেলাম। দাদীকে যেন মেরে ফেলতে না পারে, এই মনে করে তাকে মানুষের মাঝখানে রাখলাম। দেখতে দেখতে গির্জাঘর পূর্ণ হয়ে গেল, সেই সাথে চলতে থাকল প্রার্থনা আর প্রার্থনা ও আর্তনাদ। পাক সৈন্যরা ঢুকে গেল মানুষের ভিড়ে, আমার তখন মনে হল এই বুঝি আমাদের মেরে ফেলবে কিন্তু মা মারীয়ার কি দয়া তারা আমাদের ক্ষতি না করে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর গ্রামের কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল কিন্তু আগুন প্রায় লাগেনি। আবার সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে অনেককেই গুলি করতে চাইল। অনেকের বাড়ি থেকে ধন-সম্পদ লুট করে নিতে চাইল, কিন্তু ঈশ্বরের কি লীলা, কি মায়া, তারা কোনটাই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। স্বর্গীয় মায়ের শক্তিতে অপশক্তিকে পরাভূত করা হয়েছে।' কয়েক ঘণ্টার চিরুণী অভিযান সাঙ্গ হলে পূর্বদিকে গণকাডাং-এর দিকে যাত্রা করে, এই সময় একজন সাঁওতাল নারী ধর্ষণের শিকার হন। হিংস্র হায়েনার দলেরা গ্রামে ঢুকতেই গুলি ও বোমাবর্ষণ করতে থাকে; যারা ছিলেন, দিকশূন্য হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। গ্রামের একজন পৌঢ় ব্যক্তি আসমান টুডু গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, যেদিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন, নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। কয়েকদিন বারুদের গন্ধে মানুষেরা ঘুমাতে পারেনি। সেদিনের সাড়াশি অভিযান পাকিস্তানীদের তৃপ্ত করতে পারেনি; এ যেন চৈত্রের দুপুরের তীর্থের কাক। গণকাডাং থেকে পশ্চিমে ঈশ্বরীপুরের দিকে বেঁকে যেতে শুরু করলেন সৈন্য সামন্তরা। ঈশ্বরীপুরে প্রবেশের সাথে সাথেই অতিথি পাখি শিকারের প্রাক্কালে গুলি ছোড়ার মতো করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গ্রামে প্রবেশ করলেন। গ্রামের অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হলেও ৬জন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মৃতদের লাশ নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফেলে রেখেই ফিরে গেলেন। যারা নরক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদের ভাষ্যানুযায়ী– পাকিস্তানীদের বহরে কমপক্ষে হলেও ১২০ জনের মতো হবে। এতো বিশাল বাহিনীর হিংস্রতার চিহ্ন রয়ে গেল নবাই বটতলার ঊষর প্রান্তরে।

বাংলাদেশের প্রসব বেদনায় জর্জরিত। ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত গঙ্গায় যুক্ত হয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসী-অন্তজ শ্রেণীর শরীরের তাজা রক্ত। এতো বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও সেদিন গির্জায় একজন মুসলিম গর্ভবতী নারীর প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং গির্জা ঘরের মধ্যেই সন্তানের জন্ম দেন। এটি যেন নতুন বাংলাদেশ জন্মের পূর্বাভাস জানান দিয়েছিলো। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় কিন্তু অমূলক নয়। একদিকে মৃত্যুভয়, আবার নবজন্মের আনন্দ; কোনোটিই উপস্থিত খ্রিস্টভক্তসহ অন্যরা উপভোগ করতে পারেন নি। কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলো, মা মারীয়া আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই গির্জায় আশ্রিতরা স্বাধীন ও মুক্ত বাংলাদেশের স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন।

৭১'-এর ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের সংবাদে উল্লসিত হয়েছে দেশবাসী, হারানোর বেদনা, হৃদয়ের ক্ষতের দাগগুলো শুকাতে শুরু করে। এ বছরেই মাঠের সোনালী ফসল সংগ্রহের পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মা মারীয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আয়োজন করা হয় মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি বন্দনা ও পর্ব। গ্রামের মুরুব্বিরা চিন্তা করলেন, মহান বিজয় দিবসেই মা মারীয়া'র প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং মৃত্যুচ্ছায়া থেকে রক্ষার পূর্ণ আনন্দে সামিল হবেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার উদ্‌যাপিত হয়েছে; পুনর্বার বসলেন এবং বিশ্লেষণ করলেন, বিজয় দিবসে আনন্দে মা মারীয়া'র প্রতি ভক্তি, বন্দনা, ভালোবাসা ও একচিত্তে প্রার্থনার অনেকটা ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। অতঃপর নতুন করে দিন ধার্য করলেন বড়দিনের পরবর্তী জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ। মাঠের ফসল উত্তোলনের পরে একেবারে সুস্থির ও স্বতন্ত্রভাবেই মা মারীয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, স্মৃতিচারণ এবং নতুন প্রজন্মদের বিশ্বাসে উদ্ধুদ্ধকরণে নাটিকাও প্রদর্শিত হতো। মা মারীয়া'র মূর্তি নিয়ে নবাই বটতলার চতুর্দিকে বিশ্বাসীরা সারিবদ্ধভাবে প্রদক্ষিণ করতেন; সঙ্গে সঙ্গে রোজারি মালা প্রার্থনা ও গান গাওয়া হতো। আর এগুলোর পুরোটাই মাতৃভাষা সাঁওতালীতে পরিচালনা করে গির্জা মাষ্টার নেতৃত্ব দিতেন।

সময়ের বিবর্তনে স্থানীয় মিশন ও প্যারিসের সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আড়ম্বড়তা বেড়েছে কিন্তু মৌলিকতা বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা উৎসবের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়েছে, তবে উপলব্ধি ও আত্মবিশ্লেষণ অনুপস্থিত। অর্ধশত বছরের পূর্বের ঘটনাগুলো প্রজন্মরা ওয়াকিবহাল নন, মা মারীয়া'র অলৌকিক ক্ষমতা, ঐশরিক আশীর্বাদ সম্পর্কে জানানো আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও নবাই বটতলার '৭১-এর পর্ব আলাদা ঘটনা নয়, একই সূত্রে গাঁথা।

কৃতজ্ঞতা:

১। মিসেস কস্তান্তিনা হাঁসদা, নবাই বটতলা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
২। মি. গাব্রিয়েল মারাণ্ডী, বাগানপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী।
৩। মি. যতীন মারাণ্ডী, মণিপুরীপাড়া, ঢাকা।
৪। মি. কাশ্মীর কিস্কু, নবাই বটতলা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সাভারের ইতিকথা

ম্যাথিউস আদম কস্তা

"ঐতিহাসিক সাভারের ইতিকথা বুকের ভিতর
দেয় প্রচন্ড ব্যথা,
উঁকি মারে, দোলা দেয় বার বার তার নাম
"সাভার"!"

আজ থেকে দুইশত বছরেরও বেশী বছর পূর্বে সাভার ছিল হিংস্র বাঘ, ভাল্লুক, বন্যহাতী, বিষাক্ত সাপ আর নানা প্রজাতির বন্য জীব জানোয়ারে ভরা বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অভয়ারন্য বা স্বর্গরাজ্য হিসেবে ছিল খ্যাত ঐতিহাসিক যেই বনাঞ্চল, তার নাম "সাভার"। প্রকৃতিতে এই বনাঞ্চলে জীব জানোয়ারের অবাধ বিচরণই ছিল মূলত প্রধান যা চোখে পড়ার মতো। বিরল, বিরাম মনুষ্যবিহীন এই অঞ্চলের নাম "সাভার"। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এখানে গাজীপুর জেলার তুমুলিয়ার আশে-পাশের গ্রাম থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা নতুন নতুন বংশধর সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে ঢাকার অদূরে, অর্থাৎ সাভারের এই বনাঞ্চলে তারা তাদের তাম্বু, ছাউনী ফেলেছিলেন। এখানে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমেই তারা হিংস্র বন্য জীব জানোয়ারের আক্রমণের শিকার হন। হিংস্র জানোয়ারেরা রাতের আধারে তাদের গৃহপালিত পশু যেমন; গরু-ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগীর উপর আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়ে নিমিষেই টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলত। এমনকি, তাদের হিংস্র আক্রমণে অনেক মানুষও প্রাণ হারাতো। এসবের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতি দুর্যোগ তাদের জীবনকে আরো দুর্বিসহ করে তুলতো। ভীষণ ঝড়ে তখনকার দিনে তাদের তৈরী করা কুঁড়ে ঘর উড়িয়ে নিয়ে যেত। আর খোলা আকাশের নিচে তারা মানবেতর ও দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করত। সাভারের আরো পূর্বের ইতিহাস জানি না, তবে আমার প্রত্যক্ষ করা উনিশশো ষাট বা একষট্টি খ্রিস্টাব্দের দিকে একটি ভয়াবহ বন্যার প্রাদুর্ভাব এই সাভারে সংঘটিত হয়েছিল। সেই বন্যায় গীর্জায় প্রবেশ পথে কোমর সমান পানি উঠেছিল। লোকজন তখন ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য প্রতি রবিবার দিন নৌকা যোগে গীর্জায় যাতায়াত করে তারা ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা ও তাঁর গৌরব মহিমা প্রকাশ করত। কিন্তু তাদের এই দুর্বিসহ জীবনমরণ পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বর তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন। হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড সাহস, শক্তি, মেধা-বুদ্ধি আর মনোবল বাড়িয়ে দিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে তারা ঈশ্বরের দেওয়া বুদ্ধিমত্তা আর কৌশল কাজে লাগিয়ে বাঁশের মাথায় খড়-কুটা আর পাটখরি আঁটি বেঁধে তাতে আগুন দিয়ে মশাল বানিয়ে তীর ধনুক আর বন্দুক ছাড়াই অভিনব কায়দায় সেই সকল হিংস্র পশুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আক্রমনের জবাব দিত, প্রতিহত করত, ধাওয়া দিত। এছাড়া বিষাক্ত সাপও ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভয় আর উদ্বেগের কারণ। কেননা বিষাক্ত সাপ রাতের আধারে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মানুষকে পায়ে ছোবল মেরে দংশন করে বিষ প্রয়োগে তাদের প্রাণ নাশ করত। এসকল ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে নিশ্চিত বিজয়ের সূর্য একদিন তাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হল। ভাগ্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে তারা সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বরের দিকে মন ফিরালো। তারই আলোকে তারা কমলাপুর গ্রামে বাইট টেক নামক স্থানে উঁচু জায়গায় তালপাতা আর বাঁশ দিয়ে চাল বানিয়ে একটি গীর্জাঘর তৈরি করে সেথায় তারা প্রতি রবিবারদিন একত্র হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা ও তাঁর গৌরব মহিমা প্রকাশ করত। কারণ তারা ছিল অন্তরে দীন, ধর্মভীরু, ঈশ্বর ভক্ত আর খ্রিস্ট যিশুর আনুগত্য ও যোগ্য অনুসারী হয়ে এই অঞ্চলসমূহে খ্রিস্টের আলো তথা খ্রিস্টের বাণী প্রতি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে পরবর্তীতে তারা বিদেশী বিশপ মহোদয়ের সহায়তায় প্রায় তিন-চার একর জমির উপর ধরেন্ডা ধর্মপল্লী নামক একটি কাথলিক খ্রিস্ট মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করল। কমলাপুর, ধরেন্ডা, রাজাশন আর দেওগাঁও এই চারটি গ্রাম নিয়ে মূলতঃ এই ধর্মপল্লীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ আমরা সেই সকল প্রতিষ্ঠাতা, অকুতোভয় বীর সাহসী পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাদের হাত ধরেই এসেছিল এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মশিক্ষা, গণশিক্ষা প্রভৃতির প্রসার লাভের পর মানুষে মানুষে প্রেম ভালোবাসার নিদর্শন স্বরুপ তাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়া, বিবাহ করা, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে দিনে দিনে তারা বিকশিত হতে শুরু করল। পাশাপাশি তারা স্বনির্ভর হতে কৃষি কাজে ব্যাপক মনোনিবেশ শুরু করল। তাদের খাদ্য সংকট দূর করতে আমোন ধান, বোরো ধান, আউস ধান, আদা, হলুদ, মরিচ, কচুসহ সকল প্রকার শীতকালীন আর গ্রীষ্মকালীন ফসল উৎপাদনে বিরাট সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। তখন কৃষকদের কেউ কেউ মডেল ফার্মার হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। কৃষিতে তাদের এই সফলতার পিছনে তাদের স্ত্রীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। স্ত্রীরা স্বামীদের কাজের পাশাপাশি তাদের ছোট সোনামনিদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য স্কুলে নিয়ে যাওয়া আবার বন্য প্রাণীর ভয়ে স্কুল থেকে তাদের হাতে হাত ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসা যাওয়া ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও স্ত্রীরা রান্না-বান্নার পাশাপাশি তাদের গৃহপালিত গরু-ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগীর লালন পালন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করে স্বামীর সঙ্গে ক্ষেত থেকে কচু, বেগুন, হলুদ, মরিচ, করলা, বরবটিসহ সকল প্রকার ফসল তুলে বাড়িতে নিয়ে আসত। এছাড়াও ক্ষেত থেকে তুলে আনা বস্তায় বস্তায় কচুর মাটি পরিস্কার করবার জন্য রাতের আহারের পর পরিবারের সকলে স্তুপ দেওয়া কচুর চারপাশে জড়ো হয়ে নানান ধরনের গল্প বিশেষ করে তাদের পূর্ব পুরুষেরা "সাভার" প্রত্যাবর্তনের পর বন্য হিংস্র জীব-জন্তুর ভয় এবং কিভাবে তাদের প্রতিহত করে দিন-রাত্রী অতিবাহিত করত সেই সকল লোমহর্ষক ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা তাদের সাথে সহভাগিতা করতে করতে মনের অজান্তে তারা মনের মন, অর্থাৎ (চল্লিশ সেরে মন) কচু নিমিষেই বেছে পরিস্কার করে ঘুমাতে যেত। পরদিন সেই ফসল বাজারে বিক্রী করে গুড়, তেল, লবণ, আটা, চিনি আর ছোট্র সোনামনিদের স্কুল ড্রেস আর বড়দের শাড়ী, লুঙ্গীসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে বাড়িতে ফিরত। তখনকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। যা বাঁধ ভাঙ্গা জোঁয়ারের মতো বা উপচে পড়া জলের ফোয়ারার মতো অবিরাম মধুর মতো ঝরত। আর সেই মধু তারা আস্বাদন করত। আর তাদের সেই মধু বনে স্ত্রীরা ছিল যেন স্বামীর মাথার পাগড়ী, যা মহানায়ক উত্তম কুমারের আদলে স্বামীরা মাথায় পাগড়ী পরিধান করে নিজেদের প্রকাশ করত। তেমনি সেই মধু বনে স্বামীরাও ছিল তাদের স্ত্রীদের মাথার মুকুট আর গলার চন্দ্রহার! যা প্রিন্সেস ডায়ানা কিম্বা মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের আদলে স্ত্রীরা মাথায় মুকুট আর গলায় চন্দ্রহার পরিধান করে নিজেদের প্রকাশ করত। আর ঐ সবই ছিল ঐতিহাসিক "সাভার" বাসীর দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আর উপচে পড়া, উথলে পড়া প্রেমে ভরা, মধুভরা তাদের যৌবনের মধুময় জীবনের ইতিকথা! "সাভার" বাসীর উন্নত ভবিষ্যত, সফলতা, সমৃদ্ধি আর পারস্পরিক সহভাগিতা ও সহমর্মিতা দিনে দিনে জাগ্রত হোক এই প্রত্যাশা করছি।

পাদ্রিশিবপুর এর মুখরোচক সব রান্না

পিয়া সরকার

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের বরিশাল অঞ্চলেই তো নানা গ্রামে নানা রকম খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত। আসুন আজ বরিশাল বিভাগের বাকেরগঞ্জ থানার পাদ্রিশিবপুর গ্রামের কিছু মুখরোচক রান্নার পরিচয় দেই। শ্রীমন্ত নদীর তীরে ছোট্ট গ্রামখানি পাদ্রিশিবপুর, অথচ খাওয়া দাওয়া বিশাল ব্যাসনে একবারে ভরপুর।

ছেলেবেলা যদিও চট্টগ্রামে কেটেছে, তথাপি আমাদের বাড়িতে সব দেশী খাবারের চল ছিল। বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের সংঙ্গে সুপরিচিত হয়েছি। যেমন- বর্ষাকালে বড় চিংড়ি দিয়ে শশা ও নারিকেল দুধের টেম্পেরাদো অথবা ইলিশ ও চিংড়ির মরিচ টেংগা, কখনো ইলিশের পায়রা আবার খাবারে কেন এতো পাখি। না-এটি ইলিশের এক আয়োজন। ইলিশের টুকরোকে তেতুল ও লবণ দিয়ে মেখে মাটির হাড়িতে রেখে দেওয়া হয়। পরে প্রয়োজন মত তা বের করে সাদা ভেজে বা মসলা দিয়ে রান্না করে খাওয়া হয়। এরপর আছে শৌল মাছের ওলমা কারি। কি অপূর্ব স্বাদ। চিংড়ি বা মাংসের কিমা দিয়ে পটলের দোলমা কারি-এটা অসাধারণ এক ব্যঞ্জন। রূপচাঁদা মাছের গেলেমি এও বা কম কিসে। আহা! মুখে লেগে থাকার মত রান্না। বর্ষার ভরা মৌসুমে আসে কাঁকড়ার সব আয়োজন। বড় কাঁকড়া নারিকেলের দুধ দিয়ে দোপিয়াজা, ছোট কাঁকড়ার ঘিলু ভেজে রাখা হয় নানা পদের ব্যঞ্জন তৈরির জন্য। ঘিলুর বড়া, শাক দিয়ে ভাজি বা ঘিলুন মসল্লা ভাজি আমসি দিয়ে (আম চিকন করে কেটে তা রোদে শুকিয়ে রাখা) কি মারাত্মক যে খেতে। ভোলা কি যায়!

অতিথি আপ্যায়নে থাকে বিশেষ রান্নার আয়োজন-নারিকেলের দুধের পোলাও, মুরগীর কোরমা, মাংসের বিন্দালু, হাঁসের মাংসের ভূনা কারি, দেশী তেলওয়া মুরগীর ঝাল ঘন কারি, রূপচাদার গেলেসি চিংড়ি মাছের মালাই কারি বিশেষভাবে প্রচলিত।

এবার আসুন সাধারন দিনের রান্নায়। এতেও আছে নানা রকম বৈচিত্র্য, যেমন: কচুরলতি ও চিংড়ির পাতখোলা (কচুর লতি, নারিকেল বাটা ও চিংড়ি দিয়ে কলাপাতায় বিছিয়ে তা খোলায় রান্না) বেগুনের খাইস্যা, শশা চিংড়ি, লরউ মুরগীর কারি, ডিম দিয়ে চিচিংঙ্গা ভাজি, গাটি চিংড়ি, মিষ্টি কুমড়া চিংড়ি, কাঁচা আনারস ও চিংড়ির কারি, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া কাঠালের বীচি ও কাঁচা আনারস ও চিংড়ির কারি, পানি কচু দিয়ে ইলিশের মাথার ঘন্ট, আলুবেগুন দিয়ে বড় টেংড়ার ঝোল, দেশী টক বা ভেদি মাছের টমেটোর মাখা মাখা কারি- এছাড়া পাটশাক, কলমিশাক, টেকিশাক ভাজা, করলা-চিংড়ি ভাজা, ঢেড়শ ভাজার মধ্যে বৈচিত্রতা আছে। এবার ভর্তার কথায় আসা যাক- কাঁঠালের বিচির ভর্তা, শিম নারিকেল, সরিষার ভর্তা, খারকোল ভর্তা, বরবটি ভর্তা, করলা ভর্তা, শুটকি চিংড়ির ভর্তা, কাঁচকলা ছোলার ভর্তা, শুধু নারিকেল সরিষার ভর্তা- কি যে দুর্দান্ত স্বাদ!

এবার বলি উৎসব ও পালা-পার্বনে কি খাওয়া হয়। নতুন ধান ওঠার পর হেমন্তকালে খাওয়া হয় খুদের পানি (নতুন চালের গুড়া, চিনি, ডাবের পানি, নারিকেল ছোড়া, ডাবের শাঁস দিয়ে তৈরি এক প্রকার পানির খাবার) নতুন ধানের চাল ভাজার গুড়া ও গুড় দিয়ে বড় আকারের ভৌদ্দা (নাড়ু) নতুন চালের ফেনে ফেনে (ফ্যানভাত) ও নতুর চালের ভিক্কি বড়দিনে হয়- দোদোল, বিরিংকা, দুধচিতই, সিইওই পিঠা, ছড়া পিঠা, নারিকেলের সন্দেশ প্রভৃতি। পুণ্য শুক্রবারে হয় রুটি পিঠা, আল্লান (চালের গুড়া, চিনি, নারিকেলের দুধের তৈরি) বুটের ডাল ও মিষ্টি কুমড়া দিয়ে নিরামিষ তরকারী। ইষ্টারে থাকে পায়েস ও নানাবিধ মিষ্টান্ন।

খেয়াল করে থাকবেন পাদ্রিশিবপুরের বেশীরভাগ রান্নায় নারিকেল ব্যবহার হয়ে থাকে। পর্তুগীজ ও ভারতীয় রান্নার প্রভাব আছে প্রচুর।

আমাদের অঞ্চলের খাওয়া দাওয়ার ছোট্ট একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। কিছু যদি বাদ পড়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নতুন প্রজন্মের কাছে অনুরোধ- প্রচলিত অপ্রচলিত এসব রান্না ধরে রাখবেন যাতে- আমাদের প্রিয় পাদ্রিশিবপুরের ঐতিহ্য বজায় থাকে।

৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

প্রতিজন শিশু/ক্ষুদ্রজন দান করুক ন্যুনতম পাঁচখানা রুটি ৫০ টাকা এবং ২টি মাছ ২০০ টাকা, মোট ২৫০ টাকা। এবার মাথাপিছু ভাগ করুন, দেখা যাবে যে, উপাসনা ও ডেকোরেশন খরচসহ প্রতি জন মাথাপিছু যে খাবার পাবে তাতে সকলেই পেট ভরে খাবে এবং আরো অবশিষ্ট দান থেকে যাবে। এভাবেই যিশু সরাসরি আশ্চর্য কাজ করেন না, কিন্তু পবিত্রতার মাধ্যমে একতায় ও সহভাগিতায় তিনি আশ্চর্য কাজ ঘটাতে পরামর্শ দান করেন। শুধু খাওয়া নয়, একই প্রক্রিয়ায় নানা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাময়ের জন্য আমরা শিশু বা ক্ষুদ্রজনের "একতাই বল" সূত্র ধরে সহযোগিতা করলে বহু অসুস্থ মানুষকে নিরাময় করতে পারবো।

পরিপূর্ণতার মূলে একতার আহ্বান: দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠ অনুসারে পবিত্র আত্মার মূল কাজ মানুষে মানুষে এবং মানুষ ও ঈশ্বরে ঐক্য গড়ে তোলা। আমাদের জীবনে সার্বিক ভাবে পরিপূর্ণতা লাভের মূল চাবিকাঠি হল একতা। খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তজনের একতায় একটি দেহ মণ্ডলী গঠনের আহ্বান। মহা উৎসবকে সার্থক করার জন্য খ্রিস্টযাগকে ঘিরে একতার আহ্বান। পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দানকে একত্রিত করে একসাথে পথ চলার আহ্বান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে এক বিশ্বাসের পতাকা তলে একত্র হতে আহ্বান। ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন সৃষ্টি বস্তু এবং মানুষ যেন ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট না পায় এর জন্য একত্রিত হয়ে ভরণপোষণ যোগানের আহ্বান। একা একা নয় বরং আইসো আমরা তাঁহার আবাসে যাওয়ার আহ্বান। পাঁচ হাজার মানুষকে সমভাবে পেট ভরে খাদ্য যোগানোর আহ্বান। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পেতে এবং অন্যের জন্য যোগান দিতে এক হবার আহ্বান। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক, পৃথিবীতে এক, খ্রিস্ট দেহ এক, সত্য মণ্ডলী এক, উপাসনা এক এবং একই সাথে স্বর্গে যাবার আহ্বান। এভাবে সমস্ত কিছুকে এক ও পরিপূর্ণ করে তোলার প্রধান উৎস হল একই সাথে পরস্পরকে ভালোবাসা এবং একসাথে শাস্ত্র বাণী পাঠ, ধ্যান এবং অনুসরণ করা।

একতার আধ্যাত্মিকতা: সাধু পলের কথা অনুসারে পরমেশ্বরের উপযুক্ত হয়ে ওঠার আচরণ-বিধি আমাদের পালন করতে হয়। এক সময়ের জন্য নয় বরং সব সময়ের জন্য আমরা যেন নম্র হই, কোমল প্রাণ হই, সহিষ্ণু হই এবং গভীর ভালোবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হই। একতায় এই আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি যদি আয়ত্ত করতে পারি তাহলে আর্থিকভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কেউ কারো থেকে পিছনে থাকবো না আবার বাহ্যিক ভাবেও মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যাপারেও আমরা কেউ কারো থেকে পেছনে থাকবো না। সকলেই খাবে পেট ভরেই খাবে এবং কিছু খাবার পড়েও থাকবে। এভাবে পারস্পরিক ছোট ও ক্ষুদ্র ভালোবাসার কারণে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মানুষের জন্য আশ্চর্য কাজ সাধিত হোক।

দোম আন্তনীও

সাগর কোড়াইয়া

ভূষণা থেকে কোষাভাঙ্গার দূরত্ব বেশি নয়। বড়জোর মাইল পাঁচেক। এখনকার হিসাবে সাড়ে আট কিলোমিটার প্রায়। ভূষণা হিন্দু অঞ্চল। এক সময় আরো অনেক হিন্দু বাস করতো। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে ধীরে ধীরে অন্যত্র অনেকে বসতি গড়ে তুলে। গ্রামের সবার অবস্থাই মোটামুটি স্বচ্ছল। জানা যায়, গ্রামের চাঁদ পরিবারের জমিদারিত্বেও গ্রামের অনেকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। তবে চাঁদ বংশের সেই জমিদারিত্ব না থাকলেও দাপট আগের মতো এখনো দেখাতে চায়।

চাঁদ বংশের বিজয় চাঁদ মনে মনে বেশ আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। জমিদারিত্ব গেলে কি হবে; প্রভাবটা এখনো বেশ খানদানি। এটা সত্য যে, এক সময় এই এলাকায় চাঁদ বংশের বেশ নাম ডাক ছিলো। তবে সময়ের সাথে সাথে সে নাম ডাক বালির ঘরের মতো ভেঙ্গে যায়। বিজয় চাঁদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচাঁদের ভয়ে বাঘ মহিষ একঘাটে জল খেতো। গ্রামের পশ্চিমে এখনো যে বিল আছে এক সময় সম্পূর্ণ বিলটাই নাকি ছিলো কৃষ্ণচাঁদের। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে জমিদারিত্ব তো ছিলই।

যাক্ আজ সবই অতীত। এই বংশেরই ছেলে কৃষণ চাঁদ। হ্যাংলা পাতলা শরীরের গড়ন। গায়ের রং তামাটে বললে ভুল হবে না। মাথায় কোঁকড়ানো ঝাকড়া চুলে বাতাস লাগলে ওকে দেখতে বেশ লাগে। চোখ দুটোতে দৃঢ়তাপূর্ণ দূরদৃষ্টি স্পষ্ট। কৃষণের মধ্যে বংশের অহংকার নেই। সারাদিন বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোই ওর স্বভাব। বন্ধুদের নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায় কৃষণ।

ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়ে ছোট কাকার কাছে মানুষ। পড়াশুনাটা বেশিদূর এগোয়নি। তবে উপস্থিত বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী। গ্রামে একবার গানের আসর বসে। কৃষণের সেকি উচ্ছ্বাস! সন্ধ্যা হওয়ার আগেই গ্রামের বটতলায় সামনের আসন দখল করে নেয় কৃষণ। সামনের দিকে ছোট ছেলে দেখে বড়দের সেকি রাগ! অনেকে বলতে থাকে, কৃষণ বেশি পাকিসনে।

মধ্যরাত পর্যন্ত গান চলে। কৃষণ রাতভর গান শুনে ভোরে বাড়িতে ফিরে আসে।

এক সপ্তাহ না যেতেই আবার গানের আসর বসে। তবে এবার নেতৃত্বে কৃষণ নিজে। গ্রামের কয়েকজন ছেলেও দলে জুটেছে। অনেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে থাকে। অবশেষে সবাই বলতে বাধ্য হয়, কৃষণের গানের আসরই বরং আগেরটার চেয়ে বেশি জমজমাট ছিলো।

কয়েকমাস ধরে মগ জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে যায় গ্রামে। পদ্মায় বড় নৌকা ভাসিয়ে মগ জলদস্যুরা রাতের বেলায় আসে। গ্রামে লুটপাট চালায় তারপর চলে যাওয়ার সময় বেছে বেছে নারী, পুরষ ধরে নিয়ে যায়। এরপর বিক্রি করে দেয় চড়ামূল্যে। রাতে পাহারা বসিয়েও মগদের ঠেকানো যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষজন ভয়ে রাত কাঁটায়। কখন জানি কি হয়।

এমনই একদিন রাতের বেলা। আকাশে চাঁদ ওঠার কথা থাকলেও কালো মেঘের কারণে চাঁদটা দেখা যাচ্ছিলো না। হঠাৎ রাতের আঁধার ভেদ করে গ্রামে রব ওঠে জলদস্যুরা পদ্মায় নৌকা বাঁধছে। একটু পরই হামলা করবে। যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। কৃষণকে ওর কাকা কতবার করে বললো, চল পালাই। কে শোনে কার কথা। কৃষণ কোনভাবেই পালাবে না বলে গো ধরে রইলো। আর ভাগ্যে যা হবার হলোও তাই। গ্রাম লুটপাট করে যাবার সময় জলদস্যুরা কৃষণকেও বেঁধে নিয়ে যায়।

বন্দি হওয়ার রাত থেকে সেই যে নৌকায়; এরপর নামার আর কোন সুযোগ নেই। নামার সুযোগ থাকবে কিভাবে, নৌকার পাটাতনের নিচে ছোট খুপড়িই হয়ে উঠে কৃষণের ঘর। জলদস্যুদের ভাষা কৃষণ কিছুই বুঝে না। তবে বুঝা যায় ঠিক মাথার ওপরের পাটাতনে ওরা বসে আছে। রাতভর পাহারায় থাকে। সকাল না রাত কৃষণ কোনভাবেই বুঝতে পারে না। কয়েকদিনের নৌকা যাত্রায় স্বাস্থ্যটা একেবারেই ভেঙ্গে গিয়েছে। পানি লবনাক্ত। খাবার বিস্বাদে ভরপুর।

কৃষণের পেটের অবস্থা কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। পাতলা পায়খানার সাথে বমি। শরীর একেবারেই দূর্বল। কৃষণ ভাবছিলো, মারাই যাবে বুঝি। এরপর আর কিছুই মনে নেই। এভাবে কতদিন গিয়েছে কৃষণ জানে না।

চোখ খুলেই সাদা আলখাল্লা পরিহিত ও দাঁড়িতে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো কৃষণ। গায়ের রং লাল টুকটুকে ফর্সা। বয়স সত্তোরের কাছাকাছি। কৃষণের মনে হলো, ও বুঝি স্বর্গে চলে এসেছে। স্বয়ং ঈশ্বর ওর সামনে দাঁড়িয়ে। স্বর্গ কিনা নিশ্চিত হবার জন্য ঘরের চারিদিকে চোখ ঘুরাতেই লোকটি দৌড়ে এলো।

ভাঙ্গা বাংলায় বলতে লাগলো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। তুমি নতুন জীবন পেয়েছ।

কৃষণ চুপচাপ ভাবতে লাগলো, তাহলে স্বর্গে এলে নতুন জীবন পাওয়া যায়! ও তো সারা জীবন জেনে এসেছে, পৃথিবীতে কয়েকবার জন্মগ্রহণ করার পর স্বর্গলাভ হয়! কিন্তু ওর বেলায় ভিন্ন হয়েছে। একবারেই স্বর্গে আসা চারটিখানি কথা নয়।

এরপর কৃষণের আর কিছুই মনে নেই। আটদিন পর ওর জ্ঞান ফিরে। একটু সুস্থ্য হতেই জলদস্যুদের কথা মনে পড়ে যায়। সমুদ্রপথের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওর কানে এসে বাজে। স্বাভাবিক হওয়ার পর কৃষণ জানতে পারে মগ জলদস্যুদের কাছ থেকে পর্তুগীজ ফাদার মানুয়েল দ্য রোজারিও ওকে ক্রয় করেন। তখনো পর্যন্ত কৃষণের জ্ঞান ছিলো তবে পাগলের প্রলাপ বকছিলো সারাক্ষণ।

এই যাত্রায় কৃষণ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠতে আরো কয়েক সপ্তাহ লাগে।

এরই মধ্যে ঘটে অলৌকিক ঘটনা। একদিন রাতে ঘুমিয়ে আছে কৃষণ। স্বপ্নে দেখে আলোর ঝলকানিতে অন্ধকার ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে। যুবক মতন একজন সাধু পুরুষ ওর সামনে এসে দাঁড়ানো। কৃষণ সাধুটিকে দেখে অজান্তে হাতজোড় করে হাঁটু দেয়। সাধু ব্যক্তি নিজেকে সাধু আন্তনী বলে পরিচয় দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এভাবে আরো তিন রাত সাধু আন্তনী কৃষণকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে বলেন।

কৃষণের হয়েছে সমস্যা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে। কি করবে ভেবে পায়

না। বাপদাদার ধর্ম কি এত সহজে ত্যাগ করা যায়? স্বপ্ন নিয়ে ফাদার মানুয়েলের সাথে আলাপ করে কৃষণ। এরপরও কোন কূলকিনারা পায় না ও।

অনেকবার রাতের আঁধারে পালিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার কথাও ভেবেছে। তবে জাত হারানোর মত অপবাদের ভয় কৃষণের মনে বরাবরই ছিলো। আবার এ কথাও অনেকবার মনে এসেছে, ফাদার মানুয়েল নতুন জীবন দিয়েছেন আর তার সাথে প্রতারণা করাটা ঠিক হবে না।

আরেকদিন রাতের বেলা। কৃষণ নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ স্বপ্নে ওর বাবা মা দেখা দেয়। প্রথমে নিজের বাবা মাকে চিনতেই পারেনি কৃষণ। কেমন যেন আবছায়া অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছিলো। তবে বাবার কণ্ঠ শুনে কৃষণ চিনতে পেরেছে। বাবার কথা বুঝার চেষ্টা করে ও। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে বুঝতে পারে।

কৃষণের বাবার ইচ্ছা কৃষণ যেন দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, যিশুর কথা ওকে প্রচার করতে হবে।

কৃষণের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সারা শরীর ঘেমে একাকার। চুপচাপ বসে থাকে দীর্ঘ সময়। কি করবে ভেবে পায় না। সারারাত আর ঘুম নেই।

পরদিন ভোরবেলা ফাদার মানুয়েলের ঘরের সামনে গিয়ে হাজির কৃষণ। ফাদার তখনো ঘুম থেকে উঠেননি। ফাদারকে ডাকতে থাকে। ফাদার ঘর থেকে বের হতেই রাতের স্বপ্ন ও দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকার পর কৃষণকে চ্যাপেলে গিয়ে বসতে বলেন ফাদার।

সময় গড়িয়ে যায়। সূর্য তখন পূর্বাকাশে উঠে পড়েছে। কৃষণ তখনো পর্যন্ত চ্যাপেলে বসা। অনেকটা ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। কৃষণ ধীরে চোখ খুলে। সামনের চেয়ারে ফাদার মানুয়েলকে বসে থাকতে দেখে। ফাদার কৃষণের সামনে এসে বলেন, বৎস যিশুর দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হতে তুমি এখন প্রস্তুত। যদি চাও এখনই তোমাকে দীক্ষা দিতে পারি।

ফাদার, আমি প্রস্তুত, কৃষণ বললো।

খানিকবাদেই কৃষণ ফাদার মানুয়েলের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে। দীক্ষার সময় কৃষণের সেকি ভক্তিময় আনন্দ-উচ্ছ্বাস! ফাদার কৃষণকে বলেন, আজ থেকে তোমার নাম হবে দোম আন্তনীও রোজারিও।

আশৈশব স্মৃতির লক্ষ্মীবাজার: ১৪২ বছরের প্রিন্স অব ওয়েলস বেকারী

ডা: নেভেল ডি' রোজারিও

প্রিন্স অফ ওয়েলস, পুরান ঢাকার একটি সংকীর্ণ গলির একটি দোকান, যুগ যুগ ধরে ব্রিটিশ রাজপরিবারের উপাধি বহন করে আসছে। প্রিন্স অফ ওয়েলস নামের বেকারিটি ঢাকা শহরের প্রাচীনতম কনফেকশনারী ও বেকারীর একটি, যা ১৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে।

কথিত আছে যে, একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক, যার নাম ইতিহাস বিস্মৃত কিন্তু যিনি নিজেকে ওয়েলস থেকে উত্থিত হ'বার দাবিদার ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠাকালীন ধনী এলাকার স্কুলের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের জন্য এ বেকারী দোকানটি চালু করেছিলেন। এ ব্যক্তি হিন্দু তন্দুরের কাছ থেকে জায়গাটি ভাড়া নিয়ে তার দোকান শুরু করেন। সেই সময়কার প্রিন্স অফ ওয়েলস রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ নামকরণ করা হয়েছিল। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধরনের বেকারি খুবই বিরল ছিল।

কাথলিক, অগাস্টিনিয়ান মিশনারি এবং পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্মিত অনেক গির্জা এবং বহু কাঠামো সেখানে বিদ্যমান ছিল। লক্ষীবাজারে একটি ইন্ডিগো কারখানা এবং এর অফিস (এখন যেখানে কলেজিয়েট স্কুল) সেখানে ছিল।

শেখ বুদ্ধু মিয়া দীর্ঘদিন ধরে এই পেস্ট্রি দোকানের প্রধান বেকার ছিলেন এবং ব্রিটিশ মালিকের সাথে তার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তার আসল নাম ছিল শেখ বদরুদ্দিন আহমেদ, কিন্তু তার ব্রিটিশ মালিক উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাকে বুদ্ধু মিয়া নাম দেন এবং পরবর্তীতে তিনি এই নামেই সুপরিচিত হন। ঢাকা শহরের খ্রিস্টানদের নিকট বেকারীটি 'বুদ্ধুর দোকান' হিসেবেই পরিচিত।

প্রিন্স অফ ওয়েলস এর আসল মালিক ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটেন চলে যান এবং তিনি বুদ্ধু মিয়ার হাতে বেকারি পরিচালনার কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন। দেশভাগের আগে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে, বুদ্ধু মিয়া তার আসল হিন্দু মালিকের কাছ থেকে দোকানের জমি কিনে ব্যবসা চালিয়ে যান। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুরনো ভবনটিও সংস্কার করেন।

স্থানীয় মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা দোকানটি এখন কেক, পেস্ট্রি এবং বিস্কুট বিক্রিতে ব্যস্ত। লক্ষীবাজারের এমন কি নতুন ঢাকার অনেক খ্রিস্টান পরিবার বড়দিনের সময় ভিড় জমাতো বাড়ীতে কেক সামগ্রী নিজেরা মিশ্রণ করে বেক করার জন্যে। আমাদের বাবা বড়দিনের সময় কেক মিশ্রণ করে 'বুদ্ধু'র বেকারীতে নিয়ে যেতেন। আমরা এ কেক গুলোকে বলতাম 'বাবার কেক'। পরবর্তীতে একবার নারিন্দায় থাকাকালীন সব ভাইবোন মিলে মনস্থ করি যে এক সাথে সবাই মিলে বড়দিনের কেক বানাবো। কেকের পরিমাণ বেড়ে এতটা হয়ে গেল যে ঠেলা গাড়ী ভাড়া করে 'বুদ্ধু'র দোকানে যেতে হয়েছিল।

ষাটের দশকের শেষ ভাগে লক্ষীবাজারে গড়ে উঠলো ডিআইটি মার্কেট। এ মার্কেটের মাঝখানে ১ তলা সম রেস্তোরা 'রুচিরা'। রুচিরার মোগলাই পরোটা (সে সময় দাম ছিল ৮ আনা মানে ০.৫০ টাকা) ও রুচিরার দই ছিল মরণ চাঁদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কাছাকাছি ছিল 'মাশরুর'এর খাঁটি ঘি'য়ের মানসুর। হাঁটা পথ ধরে সদর ঘাটে যেতে Royal Stationary সামনের রাস্তার চটপটি, ফুসকা আর দই বড়ার ভ্যান। আর একটু দূরে বাংলাবাজারের মোড়ে 'কাফে কর্ণার' এর খাসীর ক্র্যাম্প চপ। হেমেন্দ্র দাস রোডের মাথায় 'কানার রেস্টুরেন্টে ছিল ২ আনার (০.১২ টাকা) গরুর শিক কাবাব। পরে আরো এলো শ্রীলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি ও দই।

দাদীর উপহার- কাঠ-পেন্সিল

ভাষান্তর : ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

ইংরেজী পরীক্ষা খারাপ দেয়ায় রাজু মন খারাপ করে ঘরের মধ্যে একাকী দিন পার করছিল, তখন তার দাদী কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনাস্বরূপ একটি কাঠ-পেন্সিল উপহার দিলো। উপহার পেয়ে রাজু তার দাদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। রাজু তার দাদীকে বললো যে, সে পরীক্ষায় খারাপ করেছে বলে কাঠ-পেন্সিলটি সে নিতে চায় না। দাদী তাকে কাঠপেন্সিলটি দেয়ার কারণ খুলে বললো। দাদী বললো, কাঠ-পেন্সিলটি ঠিক তোমার মত, যেটির কাছ থেকে তুমি অনেক শিক্ষা নিতে পারো। কাঠ-পেন্সিলটিরও অনেক কষ্ট হয়, যখন ব্যবহারের জন্য পেন্সিলটি কাটা হয়। ঠিক যেমন, তুমি পরীক্ষায় ভালো করোনি বলে কষ্ট পাচ্ছো। তবে, ভবিষ্যতে এই কষ্টই তোমাকে একজন ভালো ছাত্র তৈরি করবে। যেভাবে কাঠ-পেন্সিলটি তার ভেতর থেকে ভালোটা বের করে আনতে হাজার কষ্ট সহ্য করে, তুমিও তোমার শক্তি খুঁজে পেতে পারো কষ্ট পাবার পর।

দাদী রাজুকে আরও বললো যে, এই কাঠ-পেন্সিলটি যেকোন জায়গায় অঙ্কন করে তার চিহ্ন রাখতে পারে, ঠিক তেমনি, তুমিও এই কাঠ-পেন্সিলটির মত অনেক কিছু করতে পারো; যদি তুমি চাও। এসব কথা শুনে রাজু নিজের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেলো এবং পণ করলো যে, সে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল করবে পরীক্ষায়।

ছোট্ট বন্ধুরা, রাজুর এই গল্পটি আমাদের ধৈর্য ধরার পাশাপাশি নিজের মধ্যে যে শক্তি-সামর্থ রয়েছে, তা দিয়ে ভালো কিছু খুঁজতে ও বুঝতে শিক্ষা দেয়। তাই, পরীক্ষায় খারাপ করলেও মন খারাপ না করে আরও ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। আমি করবো, তোমরা করবে তো ?

মূল: *A Tale of a Pencil*
Source: *Google*

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

অরিন রোজারিও
শ্রেণি: ৭ম
রায়েরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

আশার ভেলা

ক্ষুদীরাম দাস

আমার আশার ভেলা
নয়তো হেলাখেলা;
আমি স্বপ্নগুলোকে জড়ো করি,
অনুক্ষণ আমি ভেলা ভাসিয়ে চলি
সমুদ্রের মোহনা আমায় ইশারা করে
আমার স্বপ্ন উজ্জ্বল আমি দেখি।
আমার আশার ভেলা, আমার স্বপ্ন;
স্বপ্ন ভাঙ্গার যন্ত্রণা আমি চাই না,
চাই না কোনো লগ্ন।
আশার ভেলা ভেসে চলুক
সকল আশাবাদীর
যতই যাতনা জড়াক
হোক এক নতুন প্রহর
একদিন ছুঁয়ে নেবে সবে
সমুদ্রের সেই সুনীল প্রান্তর।

আশীর্বাদ

জনৈক লেখক

পৃথিবীকে অন্ধ বলে কলঙ্কিত করবো না
আমি নিজেই দৃষ্টিহীন হয়ে
দিনে দিনে সাজিয়েছি
পাপময় পৃথিবী বলে।
প্রভু আজ আর পুষ্পাঞ্জলি নয়
প্রতি প্রহরে আমার এক একটি
কুশ্রী ঢিবি
অর্পণ করি তোমার পদাঙ্কে
তোমার অপার কৃপায় তা গলিয়ে
আমাকে দাও আশীর্বাদ,
দুধে-জলে নয় তোমার অনুগ্রহে
আমাকে পবিত্র করে গ্রহণ করো
তোমার মনের মত করে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদেরকে অনুরোধ করেন পোপ মহোদয়

জুলাই মাসের এক দুর্লভ সর্বজনীন অধিবেশনে পোপ মহোদয় বিভিন্ন ধর্মসংঘের সদস্যদের আহ্বান করেন প্রার্থনা করতে যারা ভবিষ্যতে নিজেদের ধর্মসংঘের বিশেষ অনুগ্রহদার বহন করে নিয়ে যাবে।

গত সোমবার সকালে পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৬টি নারী ধর্মসংঘের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎপর্বের শুরুতেই তিনি জানতে চান তাদের কতজন নবিস আছে এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সন্তান স্বরূপ সদস্যরা না থাকলে তাদের ধর্মসংঘ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। পোপ জানান, আমি নবিসদের সংখ্যা জানতে চেয়েছি কেননা তা আপনাদের ধর্মসংঘের ভবিষ্যত নির্দেশ করছে। পুণ্যপিতা উৎসর্গীকৃত জীবনের আধ্যাত্মিকতার দু'টি দিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। বিষয় দু'টো হলো- সৌন্দর্য ও সরলতা।

ঈশ্বরের দয়া ও সৌন্দর্য: প্রত্যেকটি ধর্মসংঘের ইতিহাস হলো সৌন্দর্যের কিছু গল্প যেখানে ঈশ্বরের দয়া ও সৌন্দর্যময় মুখমণ্ডল ফুটে ওঠে। অধিবেশনে উপস্থিত উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদেরকে তাদের ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের সাক্ষ্য বহন করতে আমন্ত্রণ জানান পোপ মহোদয়। কেননা প্রতিষ্ঠাতারা ঈশ্বরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারে তা বিভিন্ন উপায়ে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি একান্তভাবেই আপনাদের উপর যে, আপনারা তা চলমান রাখবেন কি না! যেমনটি আপনাদের পূর্বসূরীরা বর্তমান জগতের বাস্তবতায় খ্রিস্টের সৌন্দর্য অন্বেষণ ও সম্প্রসারণ করেছেন।

সরলতা-অপরিহার্য যা তা বেছে নেওয়া: পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা যা কিছু অপরিহার্য তা বেছে নেন আর যা অনাবশ্যক তা পরিহার করেন। এভাবেই তারা প্রতিদিন মঙ্গলসমাচারের আলোতে ঈশ্বরের প্রেমের সরলতার নিজেদেরকে গঠিত হতে দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মসংঘের অধিবেশনের প্রাক্কালে 'সরলতার অনুগ্রহদান' পাবার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন পোপ মহোদয়। যা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ এবং সম্প্রীতি রক্ষা করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা তা তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবে। তা করার মধ্যদিয়েই উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীরা বর্তমান সময়ের প্রয়োজন বুঝবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এক মহান প্রেরণকাজ-আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করা: উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের দরিদ্রতা ও বাধ্যতা গুণের উপর বিশেষ জোর দেন পোপ মহোদয়; কেননা এ মূল্যবোধগুলো উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের ঈশ্বর প্রদত্ত মহান প্রেরণদায়িত্ব গ্রহণ করতে সহায়তা করে। পুণ্যপিতা উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের স্মরণ করিয়ে দেন প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে পবিত্র সংস্কারের সামনে প্রার্থনা যা হৃদয় থেকে আসে এবং যা একজনকে প্রভুর দিকে চালিত করে। তাঁর বক্তব্য শেষ করার আগে তিনি আহ্বান করেন আহ্বানে জন্য প্রার্থনা করতে। কেননা উত্তরসূরি রাখা যেকোন ধর্মসংঘের জন্য প্রয়োজনীয় যারা বিশেষ অনুগ্রহদানের কাজ সামনের দিকে নিয়ে যাবে। তাই প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করো! গঠন কাজে মনোযোগী হও; যাতে করে তা ভালো গঠন কাজ হয়। - তথ্যসূত্র : *news.va*

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মৃত : প্রদীপ গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
জন্ম : ২৪/০৩/১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩/০৭/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: চড়াখোলা, কোড়াইয়া বাড়ী
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বাবা কেমন আছো তুমি, দেখতে দেখতে কিভাবে একটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছ। বাবা তোমাকে আমরা অনেক মিস করি। তোমার শূন্যতা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে চোখে জল এনে দেয়। বাবা তুমি তো সবসময় আমাদের ছায়ার মতো আগলে রেখেছ, আমাদের ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছ। কখনো কোন অভাব অনুভব করতে দাওনি। কিন্তু কিভাবে তুমিই আমাদের অভাব হয়ে গেছো। বাবা তুমি অনেক ভালো ও দয়ালু ছিলে আর কখনো কাওকে কষ্ট ও দাওনি সেই জন্যই ঈশ্বরের চোখে তুমিই ধরা পড়েছিলে। কারণ ঈশ্বরের জন্য সর্বদা বাগানের শ্রেষ্ঠ জিনিসটাই নেয়া হয়। তেমনি ঈশ্বর ও তার বাগান থেকে তোমাকে বেছে নিয়েছেন এবং নিরবে ঘুম থেকেই তার কাছে ডেকে নিয়েছেন তার সুখের রাজ্যে। তোমার জন্য আমরা সবসময় প্রার্থনা করি প্রভু যিশু যেন তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে স্বর্গ রাজ্যে অনন্ত জীবন দান করেন।

আমরা বিশ্বাস করি তুমি আম্মনী মা (ঠাকুরমা) ভালো আছো আর আমাদের জন্যও প্রার্থনা করছ।

আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি বাবা। স্বর্গধামে ভালো থাক ও আমাদেরকে আশীর্বাদ করো।

ইতি তোমার শোকার্ত পরিবার, তোমার ভালোবাসার প্রিয় জন।

স্ত্রী: সুজী গমেজ
বড় ছেলে : রকি ডি কোড়াইয়া, ছেলে বউ : সানিতা পালমা।
মেঝো ছেলে: রেজন কোড়াইয়া, ছেলে বউ: রিচি কস্তা।
ছোট ছেলে : রিকতিক ফ্রান্সিস কোড়াইয়া।
বোন : সিস্টার. দিপীকা কোড়াইয়া, ছোটবোন : দিপ্তী কোড়াইয়া।

বিজ্ঞ: ১৬/২৪

চ্যাপলেইন ও এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জাতীয় যুব কমিশন: গত ০৯-১০ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এপিসকপাল যুব কমিশন তৃতীয় জাতীয় চ্যাপলেইন ও এনিমেটর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৮ জন চ্যাপলেইন, ৮ জন সেক্রেটারী, ৩০ জন যুবক এনিমেটর ও ১৫ জন যুবতী এনিমেটরসহ মোট ৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মূলভাব: "Synodal Leadership: Engaging and Empowering Chaplain-Animator." বা "সিনোডাল নেতৃত্ব: চ্যাপলেইন-এনিমেটরদের আত্ম-নিবেদিত সক্ষমতায়ন।" উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেন প্রাক্তন জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। তিনি বলেন, "একজন কাথলিক চ্যাপলেইনের দায়িত্ব হলো: তার যুব অনুসারীদেরকে ঐশ-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-মুখী প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে; তাদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, সাধারণ জীবন-যাপন ছাপিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা একটা মহত্তর আহ্বান।"

চ্যাপলেইনসি ও গাইডেন্স সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত ও অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন, যুব কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। তিনি বলেন, "একজন চ্যাপলেইন হবেন আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে – কথায়, চাল-চলনে, সাধনা-ধ্যানে, অধ্যয়নে, এমন কি চিন্তা-চেতনায় আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃকৃষ্টি-সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ; যিনি নীতিতে খ্রিস্টীয় ও দৃষ্টিতে থাকবেন আধুনিক।" ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রাক্তন যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন গোছাল তার উপস্থাপনায় বলেন, "একজন এনিমেটর হচ্ছেন সহায়ক; ব্যবস্থাপক নন; তাই যুবাদের নিজেকে সেবার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে নবনিযুক্ত সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়া হয় এবং একই সাথে প্রাক্তন সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

পরবর্তীতে ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী নতুন সভাপতি মহোদয়কে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান এবং প্রাক্তন সভাপতি'কে তার দীর্ঘ সময় সেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে, জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি'কে জন্মদিনের ফুলের শুভেচ্ছা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের (বিসিএনজি) ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২৪

মালা রিবেরু: গত ২৭-২৯ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, তিনদিনব্যাপী গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার পূবাইলের ভাদুনের ফাদারটেকে বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ঢাকা শাখা গীল্ডের সদস্যসহ টাঙ্গাইলের কুমুদিনী, রাজশাহী, যশোহর ও দিনাজপুর শাখা গীল্ডের সদস্যরা উপস্থিত হয়। বিকালে রেজিস্ট্রেশনের পরে ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ, আধ্যাত্মিক পরিচালক (বিসিএনজি) পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎর্সগ করেন। রাতে খাবারের পর বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মেবেল ডি'রোজারিও'র পরিচালনায় পরিচয়পর্ব ও শাখা গীল্ডের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের বিভিন্ন উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনার পরে সিস্টার গ্লোরিয়া সবিতা গমেজ এসসি, সভাপতি ঢাকা শাখা গীল্ডের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিলো বার্ষিক সাধারন সভা ও দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন। প্রধান অতিথি বিশপ (অব) থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি ও বিশেষ অতিথি বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি'র পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্ব শুরু হয়। ৯০জন সদস্যের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট মেবেল ডি' রোজারিও, এরপর ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি রিচার্ড ববি রিবেরু, সিস্টার ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ওএলএস, বিশপ পল পনেন কুবি এবং বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বক্তব্য পর্ব শেষ হয়। এরপর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন পাঠ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন শাখা গীল্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করা হয়।

বিকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা'র নেতৃত্বে ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ ও ফাদার কুঞ্জন মেবার্ট কুইয়া এর সহযোগিতায় নির্বাচন-২৪ (২৩তম কেন্দ্রীয় কমিটি) অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বরণ ও পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারী ড্র'র মধ্য দিয়ে ২য় দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তৃতীয়দিন ছিল শিক্ষা অধিবেশন। অধিবেশন বিভিন্ন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন মালা রিবেরু, ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ, প্রফেসর মেবেল ডি' রোজারিও, রাফায়েল বিশ্বাস। এরপর সহ সেক্রেটারী তেরেজা বাড়ৈ- ধন্যবাদ জানান ও সবার নিরাপদ যাত্রা কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদপুর কোয়াজি-ধর্মপল্লীতে প্রার্থনা বর্ষ বিষয়ক সেমিনার

সিষ্টার পুষ্প ক্রুশ এলএইচসি: আগামী ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস 'আশার তীর্থ যাত্রী' রূপে ঘোষণা করেছেন। জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে তিনি ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষকে "প্রার্থনা বর্ষ" রূপে ঘোষণা করেছেন। পুণ্যপিতার ঘোষণা অনুসারে বিগত ১২ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পরিবার ও জীবন বিষয়ক কমিশনের সহযোগিতায় ফরিদপুর কোয়াজি ধর্মপল্লীতে ৮০জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে দিন ব্যাপি একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

পাল-পুরোহিত ফাদার বরুন গোমেজ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর ফাদার ডেভিড ঘরামী, জুবিলী বর্ষের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, মণ্ডলীর শিক্ষা ও ডিকাস্তিরী ফর এভানজিলেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান' (লুক ১১:১) এর বিষয় বস্তু, নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা সমূহ ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সিষ্টার অঞ্জলী এলএইচসি, মা-মারীয়ার বাধ্যতা, বিনম্রতা এবং ঈশ্বরের কথায় 'রাজি হওয়া' এবং মা-মারীয়ার দর্শনগুলো নিয়ে সহভাগিতা করেন। সেমিনারে পরিবার ও জীবন বিষয়ক কমিশনের সদস্য-সদস্যাগণ, সিষ্টার পুষ্প ক্রুশ এলএইচসি, সেক্রেটারী, পরিবার কমিশন, সিষ্টার শিউলী, এসএমআরএ, মি. মিন্টু বৈদ্য, মি. ফিলিপ সমদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিকালের খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত করা হয়।

কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদিবাসী জনগনের ভূমির সমস্যা সমাধানে ভ্রাম্যমান ভূমি সেবা কেন্দ্র

আন্তনী দ্রং: গত ১৫ জুলাই, সোমবার ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার ধাইরপাড়া কাথলিক মিশন হলরুমে কারিতাস আলোক-৩ ও ইসিএলআরসি প্রকল্প কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ ভূমি সেবা কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের নিয়ে আদিবাসীদের জন্য একটি উন্মুক্ত আলোচনা সভা ও মতামত বিনিময়ের আয়োজন করা হয়; যার মাধ্যমে জনগণ তাদের ভূমি বিষয়ক সমস্যা এবং তার সমাধানের নানাবিধ উপায়সমূহ জানতে পারে।

ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভেরিওয়েল পিটার চিসিম এর সভাপতিত্বে ভ্রাম্যমান ভূমি সেবা কেন্দ্রে ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম কাউন্সিলের প্রতিনিধি ও ভূমি সমস্যায় জর্জরিত ৩৫ জন আদিবাসী পুরুষ-মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ধোবাউড়া সদর ইউনিয়নের ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা শ্রী ভজন বিহারী সরকার আলোচনায় বলেন যে, আদিবাসীরা আদি থেকেই ভূমি সম্পর্কে উদাসীন এবং অসচেতন। এই কারণেই আদিবাসী জনগণ ভূমি সম্পর্কিত বিবিধ হয়রানির শিকার হয়ে আসছে। তিনি বলেন যে, আদিবাসী বিষয়ক যেকোন সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস সার্বক্ষণিক সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিনিধি এবং আলোক-৩ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন এডভোকেট জনাব দীনেশ দারু বলেন, এই প্রোগ্রাম অত্র এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। জমির মালিকানা হওয়ার জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো আবশ্যক সে বিষয়েও তিনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনায় ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা এবং এডভোকেট জনাব দীনেশ দারু -এর সাথে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে কারিতাস এর আলোক-৩ প্রকল্পের ধোবাউড়া উপজেলার মাঠ কর্মকর্তা, অতুল ম্রং, কমিউনিটি অর্গানাইজার নিশান রেমা, রুমেল মৃ, ইসিএলআরসি প্রকল্পের কমিউনিটি অর্গানাইজার ডমিনিক রুরাম এবং অনলাইন সংবাদ সংস্থা সময়ের কাগজ, ময়মনসিংহ বিভাগের প্রধান প্রতিনিধি, আন্তনী দ্রং প্রমুখসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুশরইল সাধু পিতর সেমিনারির পরিচালকদের বিদায় ও বরণানুষ্ঠান

লর্ড রোজারিও: ৮ জুলাই সোমবার মুশরইল সাধু পিতর সেমিনারির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফাদার শ্যামল জেমস গমেজকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং একই সাথে সেমিনারির পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী উচ্চশিক্ষা শেষে ফিরে আসায় তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন সকাল ৬ টায় বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিদায়ী পরিচালক ফাদার শ্যামল গমেজ এবং তাকে সহায়তা করেন পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী সহ ধর্মপল্লী ও সেমিনারির অন্য ৩ জন ফাদার। খ্রিস্টযাগে সিস্টার, সেমিনারিয়ানসহ কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে বলেন, "যিশু আমাদের আহ্বান করেন তার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে এবং তার সাথে জীবনযাপন করতে। অনেক সময় আমরা শুধুমাত্র বিপদের সময় প্রার্থনা করি কিন্তু আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত সকল সময়ের জন্য। যিশু আমাদের শিক্ষা দেন একে অপরের হাত ধরে একসাথে পথ চলতে। তাই আসুন আমরা একসাথে যিশুর সাথে পথ চলি।" খ্রিস্টযাগের শেষে বিদায়ী ও নবাগত পরিচালকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় এবং ফাদারদ্বয় তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

পরিশেষে,মশরইল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ বিদায়ী পরিচালক ফাদার শ্যামলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মহাপ্রয়াণের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী

"তুমি আছো আলো হয়ে হৃদয়ের গহীনে, সুপ্ত প্রকাশিত অবিরত
এই পৃথিবীতে আমরা আবদ্ধ তোমার ভালোবাসায় প্রতিনিয়ত।"

প্রয়াত ফাদার জ্যোতি এ গমেজ
জন্ম: ২১ জানুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তুমি ছিলে সর্বদা আমাদের মাঝে অনাবিল আনন্দের উৎস হয়ে। তাই তোমার চলে যাওয়া মেনে নিতে এখনও অনেক কষ্ট হয়। তুমি ছিলে বিশালতার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বুকে সমুদ্রসম ভালোবাসা নিয়ে আমাদের সব সময় আগলে রেখেছিলে। পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে বৃক্ষের মতো ছায়াতলে রেখেছিলে আমাদের। তোমার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে সবাই বিমোহিত হতো। তোমার বিশালতা ও ভালোবাসা দিয়ে মুগ্ধ করেছো বন্ধু-বান্ধব, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, সাধারণ জনগণ, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সকলকে। যাজক হিসেবে তুমি ছিলে বিশ্বস্ত, দায়িত্বপরায়ণ, ধার্মিক, সময়ানুবর্তী ও নিবেদিত তোমার যাজকীয় জীবন ছিলো সবকিছুর ঊর্ধ্বে। উদারতা ও পরোপকারীতার এক বিশাল ভান্ডার নিয়ে তুমি জন্মেছিলে। তুমি একাধারে ছিলে সংস্কৃতিমনা, সৃজনশীল প্রজ্ঞাবান ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তোমার পান্ডিত্য ও দৃঢ়চেতা দৃষ্টিভঙ্গি হতে এখনও আমরা অনুপ্রাণিত হই। তোমার অসুস্থতার সময় নীরবে নিভৃতে কতো যন্ত্রণা সহ্য করেছো। কখনও কোন অভিযোগ বা হতাশা ব্যক্ত করোনি। কখনো কারো উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে চাওনি। তুমি ছিলে অসীম জীবনী শক্তির অধিকার তাই সকল সুখ ও দুঃখের সময় তোমাকে আমরা বার বার মনে করি। তোমার সকল আদর্শই আমাদেরকে এই কন্টকময় পৃথিবীতে পথ দেখায়। তুমি সব সময় আমাদের পরিবার ও বংশের আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাবে।

আমরা বিনম্রচিত্তে প্রভু পরমেশ্বরের নিকট তোমার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গে তুমি পিতা ঈশ্বরের বন্দনায় নিত্যই নিয়োজিত আছো। অনুনয় করি স্বর্গলোক হতে আমাদের জন্য প্রভুর আশীর্বাদ, কৃপা ও অনুগ্রহ যাচ্না করো এই প্রার্থনায়–

দোলন যোসেফ গমেজ ও জ্যাকলিন গমেজ
ভাই বৌ: আগ্নেশ স্কলাস্টিকা গমেজ ও
সকল ভাইবোন, ভাইস্ত-ভাইস্তী, ভাগীনা-ভাগিনী, নাতি-নাতনীসহ
কাছের ও দূরের আত্মীয়-স্বজন।

বিজ্ঞ/১৬৫/২৪

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে,
শিক্ষার পথ-যাত্রায় একটু বিরতি
ও
জীবনদর্পণে গণমাধ্যম
নামক দুইটি গ্রন্থ একই সাথে প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়েছে।
সুদীর্ঘ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লেখক ফাদার কমল কোড়াইয়া ২টি গ্রন্থ লিখেছেন।

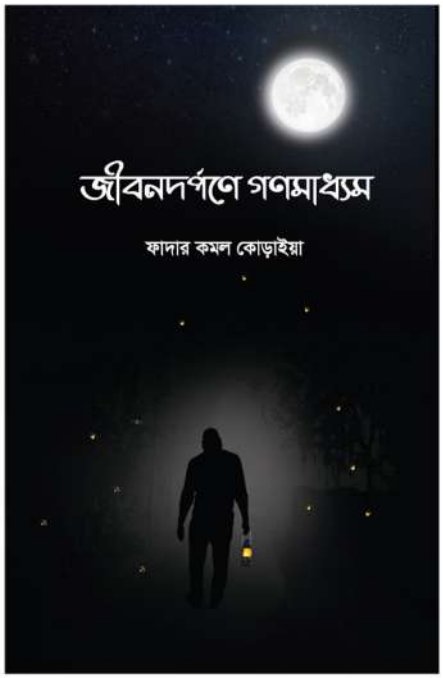

শিক্ষার পথ-যাত্রায় একটু বিরতি গ্রন্থটিতে ধর্ম ও সমাজ ভাবনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে কর্ম ব্যস্ততায় একটু বিরতি নিয়ে বইটি পাঠ করলে আপনি অনেক কিছু জানাসহ অন্তরে তৃপ্তি ও নির্মল আনন্দ পাবেন।

জীবনদর্পণে গণমাধ্যম গ্রন্থটি মিডিয়া বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা, নির্দেশনা ও ভাবনার সাথে অনেককে জড়িত করার প্রচেষ্টায় গণমাধ্যম বিষয়টিকে লেখক নিয়ে গেছেন ধর্মপল্লী পর্যায়ে। মণ্ডলীতে তার বাস্তবায়ন বইটির মূল উপজীব্য বিষয় হলেও দেশপ্রেম ও জীবন বাস্তবতা বিষয়ক লেখাগুলোও মানুষের মনকে আকর্ষণ ও আনন্দ দান করবে।

বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে -

❖ প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষীবাজার ও প্রতিবেশী'র সকল বিক্রয়কেন্দ্রে।

বিজ্ঞ/১৬৪/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৬
Regd. No. DA-33
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 26
❖ 21 - 27 July, 2024, ৬ - ১২ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার
বকুল এস রোজারিও সিএসসি

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

২৪ জুলাই, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালোবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৬২/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org